হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

পথের আলো

শ্রাবণ * ১৪২১

একোনপঞ্চাশৎ বর্ষ * চতুর্থ সংখ্যা

বন্দে বন্দারুমন্দারং বৃন্দারকবিবন্দিতম্।
স্মেরাস্যং সুন্দরং সৌম্যং সীতারামং সনাতনম্॥
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংস-কুঞ্জর-কেশরী।
কালিন্দী-কলকল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী॥

উপদেষ্টা মণ্ডলী

সংঘ আচার্য্য এবং সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ
সাহিত্যিক শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যুগ্ম-সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং
কিঙ্কর সামানন্দ

সহ-সম্পাদক

শ্রী সমীরণ মুখোপাধ্যায়

সঞ্চালক, বার্তা বিভাগ

কিঙ্কর প্রণবানন্দ

সঞ্চালক, উপায়ন বিভাগ

শ্রী তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়

সঞ্চালক, শ্রীকোষ বিভাগ

শ্রী দীপক দেবনাথ

কর্মাধ্যক্ষ

শ্রী অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামিলন মঠ

৭/৭, পি.ডব্লিউ.ডি. রোড, কোলকাতা - ১০৮
দূরভাষ ঃ ২৫৭৭ ৫১৭৯/২৮৭৩ ২৪৩৮
website : www.patheralo.org

সূ চী প ত্র

বারো টাকা মাত্র

সম্পাদকীয় * ১০৮
শ্রীশ্রীচণ্ডী *
শ্রীশ্রীঠাকুর ১০৯
মন্মাথ শ্রীজগন্নাথ *
কিঙ্করী যোগমায়া দেবী ১১১
চাতুর্ম্মার্স্য *
কিঙ্কর শরণানন্দ ১১৩
কিঙ্কর ভূমানন্দ ঃ একটি নিঃশব্দ...নাম *
কিঙ্কর সমীরণ ১১৫
অথ চাতুর্মাস্য উল্লাস *
শ্রী প্রদীপ দাস ১২৩
জীবন খাতার পাতায় পাতায় *
শ্রী জয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় ১২৭
মহানন্দের সন্ধানে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের...রাজ্যে *
সূরথ চট্টরাজ ১৩০
নবজন্ম *
দেবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১৩৩
সংঘ সমাচার
একটি বিরল মহাপ্রয়াণ মহোৎসব *
কিঙ্কর দেবনাথ ১৩৫
কবিতা
আশীষ *
কিঙ্করী মহুয়া ১৩৭
গুরুপূর্ণিমায় প্রণতি *
বন্ধন মুখোপাধ্যায় ১৩৭

প্রতি সংখ্যা ঃ বারো টাকা মাত্র *** বার্ষিক সডাক মূল্য ঃ একশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র

সম্পাদকীয়

শ্রীশ্রীঠাকুরের এবারের লীলায় একদিকে যেমন সকল দেবতার, তীর্থের, শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন প্রকাশিত হয়েছে; তেমনি গুরু, শিব-শক্তি এবং জগন্নাথদেবের বিশেষ মহিমাও কীর্ত্তিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি এবার তিনি সকল দেবতা, ইষ্টের প্রতি মানুষকে অগ্রসর ক'রে তার পূর্ণতার চাবিকাঠি হাতে তুলে দিয়েছেন শ্রীগুরুপ্রপন্নতার পথে। স্বয়ং গুরুপাদুকা বক্ষে ধারণ ক'রে বে-নজির নজির স্থাপন করলেন। সমগ্র লীলায় আচরণ ক'রে শেখালেন শ্রীগুরুসেবা ও ভক্তি কাকে বলে। তাঁর লেখনীমুখে আবির্ভূত হলেন 'শ্রীগুরুমহিমামৃত' এবং 'গুরুপূজা' নামক দুটি মৌলিক গ্রন্থ। যা সকলের অবশ্যই পথ এবং প্রাপ্তি। এছাড়া আরও বহু স্থলে, সেটা গ্রন্থ, প্রবন্ধ কিম্বা চিঠি যা-ই হোক্ সর্বত্রই 'গুরু'র কথা তিনি আমাদের বলেছেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথদেব যুগের প্রয়োজনে এবং 'যার পেটে যা সয়' সেদিকে বিশেষ করুণাবশতঃ ক্ষেত্রবিশেষে পথের বৈচিত্র্যের নিদর্শন লীলায় রেখেছেন। তবু নামসংকীর্তনকে যেমন সর্বসাধারণের জন্য বিশেষ শক্তিযুক্ত ক'রে উপহার দিয়েছেন, তেমনি সদাচার, শুদ্ধাহার ও কালে উপাসনার কথাও বলেছেন। বলেছেন—নাম, রূপ, লীলা ও ধামের অন্ততঃ একটিকে আশ্রয় করার কথা। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন গুরু ও শিব অভিন্ন। শিব আবার শক্তি সমন্বিত। শ্রীমৎ ভূমানন্দদেব বলতেন, 'কিছু না পারলে শ্রীঠাকুরকে ধ'রে পড়ে থাকো, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো, তিনিই শক্তি দেবেন। তাঁর পথে চলার অনুকূল পরিস্থিতি ও যোগ্যতা তিনিই দেবেন।'

কিন্তু এযুগে প্রার্থনার আগেই আসবে প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের সৃষ্টি সংশয় থেকে, অশুদ্ধ চিত্তের প্রতিফলনে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই 'শিবনামামৃতলহরী' গ্রন্থে বলেছেন, 'শিবভক্ত অধুনা বড়ই দুর্লভ।' ঠাকুরের কাছেই আমরা শুনেছি চিত্তশুদ্ধির জন্য চাই সদাচার। শাস্ত্রে যে দশ লক্ষণ ধর্মের কথা আছে, শ্রীঠাকুর তাকে এককথায় 'শৌচ' বলেছেন। সেই শৌচ বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দু'রকম। তার মধ্যে বাহ্য ও অন্তর আহারের যদি শুদ্ধি কোন মতে রক্ষিত হয়, তবে আর চিন্তার কিছু থাকে না। আসলে 'রসনা' ইন্দ্রিয়টির অনেক শক্তি। তাকে জয় করার জন্যই ঠাকুর নাম করতে বলেছেন। নামামৃতের দ্বারাই রসনা দগ্ধ হ'য়ে যায়। প্রশ্ন হয় দগ্ধ করা তো অগ্নির ধর্ম। অমৃতে দগ্ধ হবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উত্তর পেলাম, 'মিথ্যা কথা, বৃথা কথা, যথেচ্ছ ভোজনের দ্বারা জিহ্বা কলুষিত হ'য়ে যায় সে বাইরের রসের লোভে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হ'তে থাকে। সুখ তো বাইরে নাই—সুখের স্থান হল অন্তরতম প্রদেশে। সেখানে প্রবেশ করতে হ'লে ইন্দ্রিয় জয় করতে হয়। দশটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রসনা আর উপস্থ বড় ভীষণ... তার মধ্যে রসনাই সর্বশ্রেষ্ঠা। শিবনাম অমৃতের দ্বারা রসনার পাপ দগ্ধ হ'য়ে যায়। একথা বলার উদ্দেশ্য—তার চিহ্নমাত্র থাকে না। সাত্ত্বিক ভোজনের দ্বারা দেহরক্ষা করে। তার দ্বারা প্রাণ স্থির হয়, মন স্থির হয়। মা আমার বৈখরী থেকে মধ্যমায় গিয়ে রাগরাগিণী, আলাপ করতে থাকেন।'

আমরা যদি এই আনন্দে আগ্রহী না-ও হই, জাগতিক সুখও যে রসনা জয়কারী, নামকারীর কাছে সহজে আসবে সেকথাও ঠাকুর 'শিবমহিমামৃতে' জানিয়েছেন, 'শিবনামজাপীর চরণে না চাইলেও ভোগসকল এসে লুটিয়ে পড়ে, তিনি সে সব উপেক্ষা ক'রে ভূমানন্দে মগ্ন হ'য়ে যান।'

শ্রীশ্রীচণ্ডী

প্রণব-প্রেমামৃত ভাষ্য

শ্রীশ্রীঠাকুর

[শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত চণ্ডী থেকে শ্রীশ্রীপ্রণব প্রেমামৃত ভাষ্যের শ্রীহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিটি চতুর্থ অধ্যায় থেকে আমাদের হস্তগত হয়েছে। তাই এখান থেকেই পাঠকের কাছে গ্রন্থটি নিবেদন করা হল। চণ্ডীর এক থেকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিত ও শ্রীগুরু প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ অনেকদিন পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। মহামিলন মঠে পাওয়া যাচ্ছে। —সম্পাদক]

(পূর্বানুবৃত্তি)

সপ্তম অধ্যায়, চণ্ডমুণ্ডবধ

নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতি॥ ২০

অন্বয় ঃ তত্র সটাক্ষেপ ক্ষিপ্ত নক্ষত্র সংহতিঃ নৃসিংহস্য সদৃশং বপুঃ বিভ্রতী নারসিংহী তত্র প্রাপ্তা॥ ২০

বঙ্গানুবাদ ঃ সেই রণক্ষেত্র কেশররাজির আঘাতে নক্ষত্র সকল ক্ষিপ্তকারিণী নৃসিংহের ন্যায় দেহধারিণী নারসিংহী উপস্থিত হইলেন॥ ২০

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ তত্র রণক্ষেত্রে সটাক্ষেপক্ষিপ্ত-নক্ষত্রসংহতিঃ সটা স্কন্ধস্থ দীর্ঘরোমাণি, তাসাং ক্ষেপশ্চালনং তেন ক্ষিপ্তা ইতস্ততঃ চালিতা নক্ষত্রসংহতির্যয়া সা। (সটা—স্কন্ধস্থ দীর্ঘ রোমসকল তাহাদের চালন তাহার দ্বারা ইতস্তত চালিত নক্ষত্র সকল যাহার দ্বারা।) নৃসিংহস্য সদৃশং বপুঃ শরীরং বিভ্রতী ধারয়ন্তী নারসিংহী নৃসিংহশক্তি প্রাপ্তা আগতা।

বজ্রহস্তা তথৈবেন্দ্রী গজরাজোপরিস্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা॥ ২১

অন্বয় ঃ তথৈব গজরাজোপরিস্থিতা বজ্রহস্তা সহস্রনয়না যথা শক্রঃ তথা এব সা ঐন্দ্রী প্রাপ্তা॥ ২১

বঙ্গানুবাদ ঃ সেইস্থানে ঐরাবতে আরোহণ করত বজ্রহস্তা সহস্রলোচনা যেমন ইন্দ্র সেইরূপ আকৃতি বিশিষ্টা ইন্দ্রশক্তি উপস্থিত হইলেন॥ ২১

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ গজরাজোপরিস্থিতা ঐরাবতোপবিষ্টা বজ্রহস্তা অশনিকরা সহস্রনয়না সহস্রলোচনা যথা শক্রঃ ইন্দ্রঃ তথা চ এব পাদপুরণে সা ঐন্দ্রী ইন্দ্রশক্তিঃ প্রাপ্তা।

ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্॥ ২২

অন্বয় ঃ ততঃ ঈশানঃ তাভিঃ দেবশক্তিভিঃ পরিবৃতঃ সন্ মম প্রীত্যা শীঘ্রং অসুরাঃ হন্যন্তাং (ইতি) চণ্ডিকাম্ আহ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ ঃ অনন্তর ঈশান সেই দেবশক্তি সমূহ পরিবৃত হইয়া আমার প্রীতিহেতু শীঘ্র অসুরগণকে হনন কর এই কথা চণ্ডিকাকে বলিলেন॥ ২২

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ ততঃ অনন্তরং ঈশানঃ শিবঃ তাভিঃ দেবশক্তিভিঃ পরিবৃতঃ মম প্রীত্যা মৎপ্রীতিহেতোঃ শীঘ্রং তূর্ণং অসুরাঃ দানবাঃ হন্যন্তাং ইতি চণ্ডিকাম্ আহ।

ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকা-শক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী॥ ২৩

অন্বয় ঃ ততঃ অতিভীষণা শিবাশতনিনাদিনী অত্যুগ্রা চণ্ডিকা শক্তিঃ দেবী শরীরাৎ বিনিষ্ক্রান্তা॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ ঃ শিবের বাক্যাবসানে অতিভীষণা শত শত নিনাদকারিণী শিবা পরিবৃতা অত্যুদ্ধতা চণ্ডিকা শক্তি দেবীশরীর হইতে বহির্গত হইলেন॥ ২৩

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ ততঃ হিববচনানন্তরং অতিভীষণা অতিভয়ঙ্করী শিবাশতনিনাদিনী নিনদদনন্ত শিবাবৃতা অত্যুগ্রা রৌদ্রস্বভাবা চণ্ডিকাশক্তিঃ কোপনাশক্তিঃ বা দেব্যাঃ শক্তিঃ দেবীশরীরাৎ কৌষিকীদেহাৎ বিনিষ্ক্রান্তা বিনির্গতা।

সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা।
দূতত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ২৪

অন্বয় ঃ সা অপরাজিতা ধূম্রজটিলং ঈশানং আহ চ হে ভগবন্ দূতত্বং শুম্ভ নিশুম্ভয়োঃ পার্শ্বং গচ্ছ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ ঃ সেই অপরাজিতা ধূম্রবর্ণ জটাধারী ঈশানকে বলিলেন, ভগবন্ আপনি শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট দূত রূপে গমন করুন॥ ২৪

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ সা অপরাজিতা সর্ব্ব জিত্বরী ধূম্রজটিলং ধূম্রজটাবন্তম্ ঈশানং শিবং আহ উক্তবতী হে ভগবন্ সর্ব্বেশ্বর শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ পার্শ্বং প্রতি দূতত্বং দূতভাবং গচ্ছ প্রাপ্নুহি।

ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥ ২৫

অন্বয় ঃ অতি গর্ব্বিতৌ দানবৌ শুম্ভং নিশুম্ভং চ বক্ষ্যমানং ব্রূহি, তত্র যে চ অন্যে দানবা যুদ্ধায় সমুপস্থিতা (তানপি) ব্রূহি॥ ২৫

বঙ্গানুবাদ ঃ অতি গর্ব্বিত শুম্ভ ও নিশুম্ভ দানবদ্বয়কে ও তাহাদের পার্শ্বে যে সমস্ত দানবগণ যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিবেন॥ ২৫

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ অতি গর্ব্বিতৌ দানবৌ অসুরৌ বক্ষ্যমাণং ব্রূহি কথয় তত্র তয়োঃ পার্শ্বে যে অন্যে যে অপরে দানবাঃ অসুরাঃ সমুপস্থিতাঃ সম্যগুপস্থিতাঃ।

ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ॥ ২৬

অন্বয় ঃ ইন্দ্রঃ ত্রৈলোক্যং লভতাং, দেবাঃ হবির্ভুজঃ সন্তু। যূয়ং যদি জীতবতুম্ ইচ্ছথ (তর্হি) পাতালং প্রয়াত॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ ঃ ইন্দ্র ত্রৈলোক্য লাভ করুন, দেবগণ হবির্ভাগ গ্রহণ করুন, তোমরা যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে পাতালে গমন কর॥ ২৬

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ ইন্দ্রঃ দেবরাজঃ ত্রৈলোক্যং ত্রীন্ লোকান্ লভতাং প্রাপ্নোতু দেবাঃ সুরাঃ হবির্ভুজঃ যজ্ঞভাগভোজিনঃ সন্তু ভবন্তু যূয়ং যদি চেৎ জীবিতমিচ্ছথতদা পাতালং প্রয়াত ভৃত্যকুটুম্বেন সহ ব্রজত।

বলাবলেপাদথ চেদ্ ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ॥ ২৭

অন্বয় ঃ অথ চেদ্ ভবন্তঃ বলাবলেপাদ্ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ (ভবথ) তদা আগচ্ছত মচ্ছিবাঃ বঃ পিশিতেন তৃপ্যন্তু॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ ঃ আর যদি তোমরা বলগর্ব্বে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা হও তাহা হইলে আগমন কর আমার শিবা সকল তোমাদের মাংসের দ্বারা তৃপ্ত হউক॥ ২৭

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ অথ বাক্যারম্ভে চেদ্ যদি ভবন্তঃ বলাবলেপাৎ সৈন্যগর্ব্বাৎ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ যুদ্ধার্থিনো ভবতঃ তদা আগচ্ছত আয়াত মচ্ছিবাঃ মদীয়াঃ শৃগালাঃ বো যুষ্মাকং পিশিতেন মাংসেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তাঃ ভবন্তু।

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা॥ ২৮

অন্বয় ঃ যতঃ তয়া দেব্যা সয়ং শিবঃ দৌত্যেন নিযুক্তঃ ততঃ তস্মিন্ লোকে সা শিবদূতী ইতি খ্যাতিং আগতা॥ ২৮

বঙ্গানুবাদ ঃ যেহেতু সেই দেবী স্বয়ং শিবকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তজ্জন্য ইহলোকে তিনি শিবদূতী এই খ্যাতি লাভ করেন॥ ২৮

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ যতো হেতোঃ তয়া দেব্যা কৌশিকী দেহভূতয়া শিবঃ মহেশ্বরঃ দৌত্যেন দূতকর্ম্মণা হেতুনা স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেন নিযুক্তঃ ততো হেতোঃ অস্মিন্ জগতি ইহলোকে সা শিবদূতীতি খ্যাতিং প্রসিদ্ধি আগতা প্রাপ্তা শিবো দূতো যস্যাঃ সা শিবদূতী।

-ক্রমশঃ

গুরুদেবের কৃপা ধন্যা

শ্রীমতী মিঠু চট্টোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া

ঃ যোগাযোগ ঃ
উপেন ব্যানার্জী লেন, সাতঘাট
গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলি
পিন- ৭১২১৩৭

ঃ দূরভাষ ঃ
(০৩৩) ২৬৮৩-২৯৪৭
৯৮৩১৫৮৪৭৯৩

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ

কিঙ্করী যোগমায়া দেবী

শ্রীশ্রীঠাকুর লীলাময় তাঁর লীলাকথা বলতে গিয়ে নামের যে কী মহিমা আজ সেবিকা সে কথাই বলবে। তখন সেবিকার ছেলেমেয়েরা খুবই ছোট ছোট। সে সময় সেবকের (সেবিকার স্বামী) নির্দেশ ছিল সকাল সন্ধ্যা নাম করার।

এক একসময় তারা উদয়-অস্ত নাম করত হারমোনিয়াম করতাল নিয়ে। তারা জানত শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্নাথ নিবাসে প্রায়ই আসতেন এবং ঠাকুরের কাছে তারা শুনেছিল নাম করলে সব কিছু পাওয়া যায় এবং অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটে থাকে। তাই তাদের মনে নাম জপ গেঁথে গেছিল।

একদিন নাম করার সময় তারা লক্ষ্য করলো একটি শালিক পাখি মরে কাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে নাম শুনলে বা পাখিটার সামনে নাম করলে পাখিটা বেঁচে যাবে। অবিশ্বাস্য ঘটনা, কিছুক্ষণ নাম করার পর পাখিটা গা ঝেড়ে উঠে উড়ে চলে গেল।

অসম্ভব যে সম্ভব হয়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সরল বিশ্বাসকে কার্যকরী করে লীলাময় ঠাকুর তাঁর লীলায় তাই দেখিয়ে দিলেন।

আমাদের ঠাকুর বলেছেন সব ভুলে গুরুকথায় বিশ্বাস রাখতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলে গেছেন 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।' শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে বলেছেন এবং খালি পায়ে আসমুদ্র হিমাচল জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে কলিযুগের উদ্ধার মন্ত্র নামমন্ত্র দিয়ে গেছেন। কারণ কলিযুগে নামমন্ত্রই মানুষকে উদ্ধারের একমাত্র পন্থা।

তবে ঠাকুর আরেকটি কথাও বারবার বলেছেন যে সেবার উপর বড় কিছু নেই। প্রার্থনায় আছে 'অসৎ হইতে মোরে লয়ে চলো সতে।' ঠাকুর বলতেন প্রার্থনা করছো নিজের জন্য কিন্তু সেবা সকলের জন্য। ঠাকুর আরও বলতেন গায়ে 'নোংরা লাগলে সাবান দিয়ে পরিষ্কার হয়, কিন্তু তাতে মন তৃপ্ত না হলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিলে শুদ্ধ, কিন্তু ভালোবাসার কাছে কোন বাধাই বাধা মনে হয় না। তাই ঠাকুর আমাদের সমস্ত সুবিধা অসুবিধা বুঝতেন এবং দেখতেন।

কোনসময় যদি ব্যথা কষ্টে কারও মনে কোন 'কিন্তু' বোধ আসে তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণেই তা জানাতে হবে। 'আমি যদি ভুলি তোমায়, তুমি যেন ভুলো না।' কারণ আমরা যদি ব্যথা কষ্ট না পাই তাহলে কাতরতা আসবে না, আর কাতরতা না থাকলে আকুলতা আসে না। আর আকুলতা এলেই ঠাকুর সাড়া দেন।

তাই কেউ যন্ত্রণা পেলে জানতে হবে ঠাকুর ধরে আছেন বলেই যন্ত্রণা পাওয়া, নইলে আকুলতার দ্বারা তাঁর সাড়া পাওয়া যায় না। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে প্রার্থনা 'দীন হতে পারি তবু হীন হতে পারি না।' শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অনেক পেয়েছে, সে পাওয়ার তুলনা নেই।

ঠাকুরের দয়ায় সেবিকার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে তিনি ঠাকুরময় গুরুময় করে ভরিয়ে রেখেছেন। পাঠচক্রে আমরা যখন গীতা, মহাভারত, ভাগবত, রামায়ণ পাঠ করি তখন ভগবানের কথাই স্মরণ করা হয়। তাঁদের লীলাকথাই হয়ে থাকে। তাঁদের নিয়েই স্মরণ মনন হয়। তেমনি সীতারাম কথামৃততে এমন এমন কথা আছে যা শুনলে আমাদের মন পরিচ্ছন্ন পবিত্র হয়ে যায়।

ধোপার কাছে ময়লা জামাকাপড় দিয়ে পরিষ্কার জামাকাপড় পরলেই মনটা আমাদের ভালো হয়ে যায়।

তেমনি আমাদের জীবনেও অনেক ময়লা আছে, ঠাকুর সেগুলো সরিয়ে নিয়ে ধবধবে সাদা মন তৈরী করে দেন। সে জন্য আমরা আমাদের জীবনটা নিজেরাই তৈরী করতে পারি। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন অনুভবের।

আমরা যদি গরম তেলে গোটা লঙ্কা ফেলে দিই সঙ্গে সঙ্গে তা ফেটে চোখেমুখে ছিটকে পড়বে কিন্তু লঙ্কাটা ভেঙে দু-টুকরো করে দিলে আর ভয় থাকে না। সেরকম অনুভূতি না থাকলে কিছু হবে না। নিজের মাষ্টার নিজেকেই হতে হবে।

কারোর উপর নির্ভর করে নয়। ঠাকুরকে নিয়েই যেন সবকিছু করতে পারি। 'আমি যেন তুমি ছাড়া নই' এভাবে থাকতে পারি। যন্ত্রণা কষ্ট আছেই আমাদের তবুও তাঁকে ধরে থাকলে স্মরণে মননে থাকলে আর কোন চিন্তা ভয় থাকে না। যেমন রথের দড়ি স্পর্শ করলেই সবাই ভাবে প্রভু জগন্নাথদেবের স্পর্শ পেলাম, তাঁকে কাছে পেলাম। 'সবাই ধরে রথের দড়ি, সবার মনে একই কথা, প্রভুর কাছে আছি আমি' তাই ঠাকুর তোমার শ্রীচরণে সেবিকার এই নিবেদন—

'অন্তর মন্দিরে আছি
লীলার আসন রেখেছি পাতি।
প্রভু মোর থাক অন্তরালে বসে
তন্ময় করিয়া লও মোহন পরশে,
কোথাও যেও না প্রভু আমারে ছাড়িয়া
অন্তরে থাক মোর, কর অন্তরলীলা।'

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই, সর্বস্তরে অনেক ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় এবং পত্রিকার মান উন্নয়নের সংকল্পের প্রেক্ষায় আমরা এই বৈশাখ ১৪২১ সংখ্যা থেকে 'পথের আলো'র বার্ষিক উপায়ন দেড়শত (১৫০) টাকা ধার্য করতে বাধ্য হয়েছি। পাঠক ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য, ভক্ত, অনুরাগীগণের প্রতি নিবেদন এই যে, অনুগ্রহ করে বাস্তব অসুবিধা বিবেচনা করে এই উপায়ন বৃদ্ধিটুকু স্বীকার করবেন।

এই প্রসঙ্গে আনন্দের সঙ্গে জানাই 'জয়গুরু' পত্রিকা সংরক্ষণকল্পে এই বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'পথের আলো'-তে সংযুক্ত করা হল 'জয়গুরু'। একটি মলাটে দু'টি ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন সাধন উপাচারে সমৃদ্ধ দু'টি পত্রিকা একত্রে নিবেদিত হল এবং পত্রিকায় আরও চিত্র সংযোজনের চেষ্টাও আমাদের থাকবে। শুধু আপনাদের সমর্থন ও সহানুভূতি চাই। সর্বোপরি সহযোগিতা চাই। লেখা পাঠাবেন, পরামর্শও দেবেন।

বিনীত-

সম্পাদক

চাতুর্ম্মাস্য

কিঙ্কর শরণানন্দ

প্রাচীনকালে সাধু-সন্তরা পরিব্রাজক হয়ে থাকতেন, একস্থানে দীর্ঘদিন বাস করতেন না—যাতে সেই স্থানের প্রতি কোনরকম মোহ না আসে সেই জন্য। কিন্তু বর্ষাকালে ঘোরাফেরা করা বড়ই অসুবিধা—কারণ বেশীরভাগ সাধুই ছাতা ব্যবহার করতেন না, এছাড়া বিভিন্ন নদ-নদী-নালা-খাল-বিলের জলস্ফীতির কারণে দেশ দেশান্তরে যাতায়াতের অসুবিধা, বনে-জঙ্গলে স্বাপদ জন্তুর ভয় ইত্যাদির কারণে এই বর্ষাকালের চারমাস একস্থানে থেকে সাধকভজন করতেন। শাস্ত্রেও শ্রাবণ মাস এবং কার্ত্তিক মাসকে বিশেষ পুণ্য মাস বলে উল্লিখিত আছে।

নিয়ম ও মতভেদে কেউ আষাঢ় সংক্রান্তি থেকে কার্ত্তিক সংক্রান্তি কেউ শ্রীবিষ্ণুর শয়ণ একাদশী থেকে উত্থান একাদশী আবার কেউ বা শ্রীগুরুপূর্ণিমা থেকে রাসপূর্ণিমা পর্যন্ত এই ব্রত পালন করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (বিশেষ কোন কারণবশতঃ কোন কোন বছর বাদ গেলেও) প্রায় বছরই এই ব্রত পালন করেছেন আষাঢ় সংক্রান্তি থেকে কার্ত্তিক সংক্রান্তি পর্যন্ত।

অসংখ্য ভক্ত শিষ্যসহ একস্থানে অবস্থান ছাড়াও তাঁর বিশেষ কতকগুলি নিয়ম ছিল—ঠাসা থাকতো ২৪ ঘণ্টার কর্মসূচী। নিত্য ভোর চারটেয় মঙ্গলারতি, তিনবেলা পাঠ-প্রার্থনা (জয়াবলীসহ) করাতেন স্বয়ং। তুলসীসেবা, তুলসী প্রদক্ষিণ, 'নমো নারায়ণায়' মন্ত্র জপ, 'ঐং শ্রীগুরবে নমঃ' মন্ত্রে প্রণাম (ক্রমে বাড়ানো ১০৮ থেকে ১০০৮, 'নমো নারায়ণায়' মন্ত্র আরও বেশী) নিত্য কমপক্ষে এক অধ্যায় গীতা পাঠ, শ্রীশ্রীগুরুগীতা, শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ অবশ্যই করতে হত। বিকেলে এবং সান্ধ্যকালীন পাঠ প্রার্থনার পর নিয়মিত চলতো স্বাধ্যায় (শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিত বিভিন্ন বই যথা- অভয়বাণী, সুধারধারা, পুষ্পচন্দন, মহারসায়ণ, শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী, ...প্রভৃতি)। অখণ্ড শ্রীনাম তো আছেই। চলতো অবিরাম অন্নদান মহাব্রত। শুধু আশ্রিত সন্তানেরাই নয়, যে কেউ আসতো তারাই প্রসাদ পেতো। নিত্য বাঁধা থাকতো একটা বড় সংখ্যায় 'নর-নারায়ণ' ভোজন। ভোজনের সময় স্বয়ং উপস্থিত থেকে তদারকি করতেন। এরই মধ্যে করতেন স্থানীয় দেবদেবী মন্দিরাদিতে শ্রীনাম নিয়ে পরিক্রমা। নির্দেশ থাকতো এই চাতুর্মাস্য ব্রত চলাকালীন কেউ ক্রোধ ও হিংসা করবে না, কোন কারণবশতঃ কেউ ক্রোধ করে ফেললে সেদিন উপবাস থেকে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। নিত্য প্রাতঃ স্নান তো বটেই সম্ভব এবং সহ্য হলে তিনবেলা স্নান, ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং ভূমিশয্যায় শয়ন এই ব্রতের একটি বিশেষ বিধি।

এইরকম বিভিন্ন নিয়মে বাঁধা থাকতো সবাই। মহা আনন্দের মধ্যেও সকলকে এমন চাপে রাখতেন বুঝিয়ে দিতেন এটা সংসারের একঘেয়েমি কাটাবার বিকল্প কোন আনন্দোৎসব নয়—এটা কঠোর এক সংযম ব্রত। ভোজনে এবং চলাফেরার ব্যাপারেও তিনি শাস্ত্রের উদ্ধৃতি তুলে ধরতেন সকলের কাছেই। কি ত্যাগ করলে কি ফল হয় লিখে দেওয়া হত 'লিফলেটে।'

॥ অথ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত বিধান ॥

শাস্ত্রে এই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সকাম ও নিষ্কাম ভেদে বিভিন্ন ফলপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে। সাধনার্থীর অবগতির জন্য তন্মধ্যে কতিপয় উদ্ধৃত করা হইতেছে। যথা-

১। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে যোগাদির উন্নত সাধনার অভ্যাসে বা সাধনাসহ প্রকৃত জ্ঞানালোচনায় যে কোন যোগসিদ্ধি

ও মুক্তিলাভ হয়। ইহাই ব্রতের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। মুমুক্ষু, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, সাধু, বাণপ্রস্থী, সন্ন্যাসীরাই শুদ্ধান্তকরণে এইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন।

এই ব্রত উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দ্রব্যাদির ত্যাগে নিম্নলিখিত রূপ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

২। পাকান্ন ত্যাগে দেহ মন পাপহীন হয়।

৩। দুগ্ধ, তক্র, দধি ত্যাগে গোলকপ্রাপ্তি হয়।

৪। দেবমূর্তি ও মন্দির উপলেপন মার্জনাদির দ্বারা সতত মন্দির পরিচ্ছন্ন রাখিলে বিষ্ণু আদি দেবলোক বাসের উপযোগী পুণ্যলাভ হয়।

৫। পত্রে ভোজন করিলে কুরুক্ষেত্র বাসের ফললাভ হয়।

৬। প্রস্তরপাত্রে ভোজন করিলে সতত প্রয়াগস্নানজনিত ফললাভ হইয়া থাকে।

৭। নখ লোমাদি ধারণে মুক্তিপ্রদ নিত্য গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়।

৮। বিষ্ণুপদ সেবনে গো-দানজনিত পুণ্যলাভ হয়।

৯। ভূমিতে শয়ন করিলে বিষ্ণু অনুচর হইবার পুণ্যলাভ হয়।

১০। ভূমিতে ভোজনে রাজত্ব লাভ হয়।

১১। মৌন থাকিলে বাক্‌সিদ্ধ হয়।

১২। 'নমো নারায়ণায়' মন্ত্র জপে অনশন ব্রতের ফলস্বরূপ পুণ্য সঞ্চিত হয়।

১৩। একদিন অন্তর ভোজনে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির অনুকূল পুণ্যলাভ হয়।

১৪। মধু-মাংসাদি বর্জনে মানব ঋষির ন্যায়, যোগী, জ্ঞানী ও আধি-ব্যাধিহীন তেজস্বী হইয়া থাকে।

১৫। তৈল বর্জনে সৌন্দর্য্য।

১৬। কটু, তৈল ত্যাগে শত্রুনাশ।

১৭। স্থালীপাক (হাঁড়ীর রান্না) অন্ন আদি ত্যাগে—বংশবৃদ্ধি।

১৮। গুড় ত্যাগে—স্বরের মধুরতা।

১৯। তাম্বুলত্যাগে—বহু ভোগ্য লাভ।

২০। ঘৃত ত্যাগে—লাবণ্য।

২১। ফল ত্যাগে—বুদ্ধি লাভ।

২২। শাকপত্রাদি ত্যাগে—বহুপুত্রলাভ।

২৩। সর্ববিধ ডাল ত্যাগে বা মাসকলাই ত্যাগে—রোগহীন ও সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়।

২৪। অন্নত্যাগে—সন্তান দীর্ঘজীবি হয়।

২৫। মাংসাদি আমিষ বর্জনে—কীর্ত্তি, আয়ু, যশ ও বল লাভ হয়।

এই ব্রতানুষ্ঠানকালে নিত্য প্রাতঃস্নান কর্ত্তব্য। বেশ শুদ্ধান্তকরণে পবিত্রভাবে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া যথাবিধি নিত্যকর্ম করিতে হয়। শ্বেতসীম, বরবটী, কলমীশাক, ডুমুর, কদ্‌বেল এবং এতৎ ব্যতীত কাহারও কাহারও মতে পটল ও লেবু খাইতে নাই।

ব্রত আরম্ভের দিনে যথাবিধি নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক শ্রীগুরু বা অভিষ্ট দেবতার পূজা করিবে। পরে শ্রীগুরুদেব বা তৎস্থলাভিষিক্ত পূজ্যজনের অভাবে —মনে মনে ইষ্ট ও গুরুর আদেশ গ্রহণ করিবে। অনন্তর চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সংকল্প করিবে। যথা-

বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আষাঢ়ে (বা শ্রাবণে) মাসি শুক্লপক্ষে গুরুপূর্ণিমায়াং (বা অমুক) তিথৌ আরভ্য চাতুর্ম্মাস্যাং যাবৎ অমুক গোত্রঃ অমুক দেবশর্মা (অমুক দাসঃ) (অমুক গোত্রা—অমুকীদাসী) শ্রীভগবদ্ প্রীতিকামঃ (প্রীতিকামা) চাতুর্ম্মাস্য ব্রতমহং করিষ্যে। পরে সংকল্প সূক্ত পাঠান্তে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া কৃতাঞ্জলী হইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা-

ইদং ব্রতং ময়াদেব গৃহীতং পুরতস্তব।
নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিমাপ্নোতু প্রসাদাত্তব কেশব॥
গৃহীতে♦স্মিন্ ব্রতে দেব যদ্য পূর্ণে ত্বহং ম্রিয়ে।
তন্মে ভবতু সম্পূর্ণং ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥

অতঃপর বেশ সংযত অন্তরে প্রত্যহ নিয়মিত ইষ্ট গুরুর চিন্তাসহ যথাযথভাবে ব্রত পালনে রত থাকিবে।

ব্রত উদ্‌যাপন দিবসে গণেশাদি পঞ্চদেবতার ও গুরু ইষ্ট পূজান্তে নারায়ণের যথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলী হইয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা-

ওঁ (নমঃ) ইদং ব্রতং ময়াদেব তব প্রীতৈঃ কৃতং প্রভো।
ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥

দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া শ্রীগুরু ও সাধু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ('পুরশ্চরণ প্রদীপ')

কিঙ্কর ভূমানন্দ ঃ একটি নিঃশব্দ চেতনার নাম

কিঙ্কর সমীরণ

কিঙ্কর সামানন্দজী সীতারাম ভাব প্রবাহে একটি অসাধারণ চিরন্তন বাক্য উপহার দিয়েছেন তাঁর সম্পাদনা 'বরেণ্যং ভর্গতে।' তিনি লিখেছেন, ''সীতারাম ভাব প্রবাহে ভূমানন্দ একটি নিঃশব্দ চেতনার নাম। প্রচ্ছন্ন অথচ অনিবার্য তাঁর অবস্থান। তিনি পাদপ্রদীপের আলোর সামনে আসেন নি, আলো জ্বালিয়েছেন—তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং আলো হয়ে গেছেন।''

প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই ভূমানন্দদেব? এর উত্তর পেতে গেলে একটু পিছিয়ে যাব আমরা। পঞ্চাশ, ষাট বছর আগের কথা। সারা আসাম জুড়ে তখন বাঙালি খেদানো আন্দোলন। এক শিক্ষিত যুবক ছুটে আসছেন বাংলায়। তখন তাঁর পরিচয় উদ্বাস্তু। ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন। চাকরীর জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিয়েছেন। ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন। সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান তখন বিখ্যাত লেখক, রসায়নবিদ প্রতুল রক্ষিত। যুবকটির চাকরী হয়ে গেল রাণীগঞ্জের সরকারী কলেজে। নাম শ্রী অমল রায়। একটা ছোট কথোপকথন উপহার দিচ্ছি পাঠকদের (শ্রী দিলীপ রায়ের, সম্পাদক সাঁইবোনা, সৌজন্যে)।

---অমল, রাণীগঞ্জে যাচ্ছ, রাণীগঞ্জ শুধু কয়লাখনির জন্যে বিখ্যাত নয়, ওখানে আর একটা খনি আছে—সেটা সাহিত্যের খনি। ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তীর তখন বিপুল প্রভাব। যোগাযোগ কর।

সেই অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তী পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের সান্নিধ্যে রূপান্তরিত হলেন কিঙ্কর ভূমানন্দ দেব-এ। অথচ এই ভূমানন্দদেব নিজেকে উল্লেখ করলেন 'এক নাম গোত্রহীন শ্রীভগবানের দাসানুদাস বলে।' এক কমনম্যান বলে—A common man as I am, I have a right to speak to common men all over the world and to deliver to them the message of a Master who is ours by inalienable right, who with one clear call urges upon all to hold fast to the name and do nothing else. We have simply to repeat the name. Silently or aloud at any time and place, with or without faith, caring nothing for holiness of body and mind. All that he wishes is Joy for you and me and for everybody- The name he particularly recommends is-

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

কিঙ্কর ভূমানন্দদেব শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের অপর লীলা-বিগ্রহ। তাঁর জীবন দীর্ঘ। গুহায়িত। বাইরে থেকে আমরা তাঁকে ছুঁতেও পারিনি। তিনি তো আর অরণ্যাচারী ছিলেন না—ছিলেন আমাদের সবার মাঝে।

শ্রীমৎ অনির্বাণের ভাষায় 'আলোর গভীরে শক্তির যে উচ্ছলন, তা আমাদের অগোচর। তবুও তার বাইরের প্রকাশ অনিরুদ্ধ এবং তার প্রকাশেই সবার প্রকাশ।' ঋষি অরবিন্দ সম্পর্কে শ্রী অনির্বাণ কথাগুলো বলেছিলেন। কেন জানি না আমার মনে হল কথাগুলো ভূমানন্দদেব সম্পর্কে একইভাবে সুপ্রযুক্ত।

কিঙ্কর ভূমানন্দদেবের তিনটি বিভাব—প্রজ্ঞা, প্রেম এবং প্রাণ। ভূমানন্দদেবকে দেখলে মনে হত—'একটি অণুর গভীরে মহাকাশ যেন সহস্ররশ্মি সৌরদীপ্তিতে জ্বলছে।' সীতারামের সঙ্গে এক বিশেষ সাযুজ্য লাভ করার ফলেই তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছিল এক আত্মরামতা। আত্মরতি এবং আত্মক্রীড়ায় তাঁরই যুগপৎ প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি।

ভূমানন্দজী এক আজন্ম যোগী। প্রেমী। আমরা সবাই ওর মধ্যে ডুবে আছি অথচ উনি কোথাও তলিয়ে যাননি। ওঁর সারা জীবনটাই সহজ যোগ। নিত্য জাগ্রত চেতনার সহজ যোগ। শিবাভিসারিণী মহা প্রকৃতির নিত্য যোগ। এ যোগে আমরা দেখবো ওঁর প্রজ্ঞার নিত্য সমাহিতি। আবার আর একদিকে প্রাণের নিত্য নির্ঝরণ। ভূমানন্দজীর কাছে দীক্ষা পেয়েছেন প্রচুর দীক্ষার্থী। ফলে তিনি গুরু। একাধারে ব্যাষ্টির অপর পারে সমষ্টির। একাধারে রাণীগঞ্জের, আর একদিকে সারা ভারতের।

এর আগে আগে ভূমানন্দজীকে যতবার পুজো করতে গেছি ততবারই পিছিয়ে এসেছি। ভয়ে এবং লজ্জায়। ভয়! কেন, অযোগ্য বলে। অথচ সীতারামের কথা সীতারামকেই শোনানো, এতে যোগ্যতার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে। দিলীপ রায় বললেন, 'এ পূজার সবচেয়ে জোরালো নৈবেদ্য হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। ভক্তি বলতে ভরসা পেলাম না যেহেতু সে দুর্লভ পদার্থ—বহু করুণায় তবে মেলে তার ছিটেফোঁটা।' মনে রাখতে হবে 'কৃতজ্ঞতার রসবোধ প্রায়ই ভক্তিকামীর মনে জাগে সবার আগে।'

আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা বলতে আমি আর আমার সহধর্মিণী। সেটা অনেককাল আগে। ১৯৭৮ সালে। সবে আমাদের বিয়ে হয়েছে। কোথায় যাই, শাশুড়ী মা দুটো টিকিট কেটে দিলেন পুরীর। গর্ভধারিণী বললেন, তুই যা সীতারাম বলে দিয়েছে কোন অসুবিধে নেই।

পথের পাঁচালীর দুর্গার বাবার কথা মনে আছে? হরিহর। হরিহরের মত একটা শতরঞ্চিতে বেডিং বেঁধে পুরী চলে গেলাম। খবর পেলাম শ্রীশ্রীঠাকুর অজ্ঞাতবাসে। শ্রীনিবাসে। চক্রতীর্থে। বি.এন.আর. হোটেলের সামনে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেল। প্রথমদিন দর্শন হল না। সব কাঁচের জানলা দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে পর্দা টানা। সেই প্রথম দেখলাম সদানন্দদাকে। ঘরের সামনে ছোট্ট উঠোনটিতে একটা শতরঞ্চির উপর বসে আছেন। একটা আলো আঁধারি। সামনেই জীবানন্দ দাদা। এঁদের দুজনকে চিনি, জানি, নাম শুনেছি, দেখেছি। শতরঞ্চির একপাশে বসে পড়লাম। আলোচনা চলছিল 'জন্মান্তর' নিয়ে। মাঝেমধ্যে হাসিঠাট্টাও চলছে। সেই এত কাছে বসে ওদের দেখা! ওদের কথা শোনা!

তখন বড়দিনের ছুটি চলছে। সকালে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ছোটা আর রাত্রে পাঞ্জাবী ধর্মশালায় ফিরে আসা। লিখে লিখে কিছু কথা হল। সেই চিট্ কাগজগুলো চিরকালের মত আমার সঞ্চয়ের লকারে চলে এল।

উপরের দোতলার ঘরে দীক্ষা হল। শ্রীশ্রীঠাকুর ভূমানন্দজীর হাতটা ধরে আছেন আর কানে বীজ রোপণ করছেন ভূমানন্দজী। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন মৌনে। যে কোন কারণেই হোক ভূমানন্দদেব আমার বাম কানে মন্ত্রটা বলতে যাচ্ছিলেন, ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে উহুঁ বলে এক ঝটকায় ভূমানন্দজীকে টেনে নিলেন। তারপর যথাযথভাবে দীক্ষা হল। সেই প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ দুটিকে অত কাছ থেকে দর্শন করেছিলাম। উপরের ঘরটাতে আমরা মোট পাঁচজন ছিলাম। বাকি তিনজন শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পর্কে আত্মীয়। বেলামা তার বড় ছেলে আর বড় ছেলের বউ। সম্ভবত মামার বাড়ীর সম্পর্কে। আজ আর ঠিক মনে নেই। আমি ঠিক জানি না আর কার কার ভাগ্যে এরকম সৌভাগ্য ঘটেছিল—একসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং ভূমানন্দদেব! একটা আগফা ক্লিক থ্রি নিয়ে ফটো তুলছি আর দুজনে মিলে লাফাচ্ছি থ্রি চিয়ার্স ফর সীতারাম। হিপ্, হিপ্ হুর্‌রে!

সেই শুরু বিবাহিত জীবনের, শুরু হল যৌথ আধ্যাত্মিক জীবনের, শেষ হল রাজনৈতিক জীবনের। বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের যে ছবি আমি এঁকেছিলাম আমার নিজের মধ্যে তা ফেড আউট হতে লাগল। একদিন পার্টি মেম্বারশিপ ত্যাগ করলাম।

এরপর বেশ কয়েকবার সামনাসামনি হয়েছি। শুধু বলতে পারি যতবার ওকে দর্শন করেছি ততবারই ভেবেছি 'প্রিয়মত্যন্ত বিলুপ্ত দর্শনম্।' একি জন্মান্তরীন কোন সংস্কার?

পাঠ করেছি লীলাবিগ্রহায় ধীমহি। পাগলের মত গোগ্রাসে গিলেছি 'স্তবমালা', 'স্তব কুসুমাঞ্জলি।' মহাজীবনের আলেখ্য। 'আওয়ার মাস্টার' সেই কবে নিঃশেষিত হয়ে গেছিল, এই তো এবারের আবির্ভাব তিথিতে আবার পুনঃ প্রকাশিত হল। Our Master এর নিবেদনটা নিশ্চয়ই আপনারা পড়েছেন—অভয় দিলে আমি একটু পাঠ করে শোনাতে পারি—

Master Dearest,

They bid me write about you. But how can I? How can a doll of salt plumb the depth of the sea?

(নুনের পুতুল কি সমুদ্রের গভীরতা মাপতে পারে?)

The shastras say that one has to be Siva a before one can comprehend Siva. How can I then fathom that infinite Mystery which is my Master? How can I explore the enchantment that is He?

To muse on you is to sit rapt and still, losing all power of expression. A book on you ought to ve a vast folio of blank pages. But they insist and feeble as I am, I have to comply.

(ওরা নাছোড়বান্দা আর আমি দুর্বল তাই আমাকে বাধ্য হতে হল)

The blank sheet store me in the face. Who will fill them for me?

সাদা কাগজগুলো আমার চোখের সামনে তাকিয়ে আছে কে আমার হয়ে সেগুলো ভরে দেবে?

I have neither thought nor word. I invoke your Grace.

Master, and in the words of one incomparably greater and better than myself, implore and pray :

What in me is dark.

Illumine, what is low raise and support that to the height of my great I may some how soar and prove equal to the ordeal.

With dandavats at your lotus-feet.

I remain, Master.

Your most unfit disciple Sadananda.

এই নিবেদনটা পাঠ করতে করতে বালানন্দজী মহারাজের একটা কোটেশন ভেসে উঠল—

নমন্তি সফলাবৃক্ষাঃ নমন্তি সজ্জনাজনা ঃ
শুষ্ক কাষ্ঠঞ্চ মুর্খাশ্চ ন নমন্তি কদাচন॥

যে বৃক্ষে ফল ধরে সেই গাছ আর উর্দ্ধমুখী থাকে না, অধোমুখী হয়, নম্র হয়। যতক্ষণ ওতে ফল না ধরে ততক্ষণ ঐ বৃক্ষ উর্দ্ধমুখী, মানুষের ভেতর যখন কোন সৎভাব জাগে তখন ঐ সজ্জন ব্যক্তি নম্র হয়ে যান। শুষ্ক কাঠ কখনও নম্র হয় না, মূর্খ কখনও নম্র হয় না। প্রকৃত পণ্ডিত যিনি হবেন সজ্জন যিনি হবেন তিনি অবশ্যই নম্র হবেন, ঐ নিবেদনটাতে ভূমানন্দদেব যে দীনতা your most unfit desciple প্রকাশ করেছেন তা ওঁর পক্ষেই সম্ভব।

সীতারাম সান্নিধ্যে এসে সদানন্দ চক্রবর্তীর রূপান্তর ঘটেছিল, আর ঘটেছিল বলেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন ঃ I have neither thought nor word. I invoke your Grace. স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন ঃ A great man is one who transfigure himself into various forms. এই রূপান্তরটা হল দেবত্বে উন্নীত হওয়া। দেবভাব না জাগলে মনুষ্যত্ব আসে না। আর মনুষ্যত্ব না থাকলে দেশের জাতীয়ত্ব থাকে না।

একবার, তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূল দেহের অবসান হয়েছে, কিঙ্কর রামেশানন্দজী আমাকে পাঠালেন ভূমানন্দদেবের কাছে। উদ্দেশ্য ঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে, তার একটা ভূমিকা লিখিয়ে নিয়ে আসতে। তখনকার দিনের গৌরী আশ্রম।

পরম পূজ্যপাদ কিঙ্কর ভূমানন্দজী আসনস্থ হয়ে বসে আছেন। চওড়া কপালে বিরাট বড় তিলক কাটা। জ্বলজ্বল করছে। সামনেই একটা সিঙ্গল খাটে শ্রীশ্রীঠাকুরের দারুণ বিগ্রহ। দণ্ডায়মান। সামনে কয়েকজন বসে আছেন। সবাই আমার অপরিচিত। আমি হাতে করে না নিয়েছি মিষ্টি, না নিয়েছি কোন পুষ্পস্তবক। প্রণত হলাম ওঁর শ্রীচরণে। সবাই চুপচাপ। বেশ বুঝতে

পারছি নিশ্চল নিস্পন্দ এক আনন্দরাশি আমাকে গ্রাস করছে। তাকালেন আমার দিকে। রামেশ্বর দা একটা পত্র দিয়েছিলেন। হাত বাড়িয়ে নিলেন। প্রেমের চোখ দিয়ে উনি আমাকে দেখছেন। আমিও দেখলাম। সময়ের একটা সামান্য ভগ্নাংশ। একটা ভাব ওর চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যেন ওঁর পাওয়ারফুল চশমার তলা থেকে বলছে—নাম, যশ ত্যাগ কর তবে তো আমাকে পাবে। ভেতর থেকে একটু নড়ে উঠলাম। এটা ঠিক আনন্দের অনুভূতি নয়, এর উপরে যেন কিছু।

আজও আমার চোখে সেই চোখ ভাসে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ আর আকর্ষণে আমায় ভরিয়ে দিলেন। বললেন, হল ঘরে গিয়ে বোসো, বিশ্রাম কর। প্রসাদ পেয়ে বিকেলে লেখাটা নিয়ে কোলকাতা যাবে। উঠে এসে ঐ হল ঘরটাতে বসে আছি। একা, সামনে শুধু কমলামা'র একটি চিত্রপট। চুপচাপ বসে আছি। ঐরকম জীবন্ত চিত্রপট আমি আজও কোথাও দেখিনি। গোটা হলঘরটা একটা ভয়ংকর রকমের নিস্তব্ধ। সব যেন কেমন দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

যে আমিটা মাটিতে বসে ছিলাম সেই আমিটা এখন যেন কোথায় ভেসে চলেছি। কি রকম এক অবস্থা! কাউকে কিছু বলতে পারছি না। যতদূর জানি কমলামা'র এই একটাই ছবি তোলানো হয়েছিল। কিন্তু মনের মধ্যে একটা কেমন সংশয় ছিল, ঐরকম অল্পবয়সী মহিলার ওরকম একটা ভারী চেহারা হতে পারে? যতই সংশয় থাক এখানে তো চিত্রপটটা জীবন্ত।

একটা ঘোরের মধ্যে সময়টা কেটে গেল। প্রসাদ পেয়ে বিকেলবেলাতে ট্রেন ধরে বাড়ী ফেরা।

আর একবার, ওঙ্কারনাথ শতাব্দী সমারোহ উৎসব। সনাতন সঙ্ঘের পক্ষ থেকে কিঙ্কর সামানন্দজী আমাদের আবাহন করেছেন। পরাশরদা'র সঙ্গে দোতলার ঘরে ওকে দর্শন করতে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সেবকদের বললেন, জল নিয়ে এস। গামলা নিয়ে এস, ওর (পরাশরজী'র) চরণ দুটো মুছিয়ে দাও। পরাশরজী যত সংকুচিত হন উনি তত জোর করতে থাকেন। গুরুবাড়ী বলে কথা! মর্যাদা ঠিক রাখতে হবে তো! যতদূর মনে পড়ে বিঠ্ঠলজী আলাদা গেছিলেন। বেশ মনে পড়ে মঞ্চে যখন বিঠ্ঠলজী ভাষণ দিতে দিতে ভূমানন্দদেবের পূর্বজন্ম নিয়ে ইঙ্গিত করছিলেন তখনই উনি ইশারায় চুপ করিয়ে দিলেন। সেদিন মঞ্চে বসার সৌভাগ্য হল না।

ব্যারাকপুরের দ্বিজদাসও রাণীগঞ্জ গেছিল। আমরা সবাই মূল সভামণ্ডপের বাউণ্ডারী ওয়ালের উপর বসে সবার ভাষণ শুনছিলাম। ভক্ত সমাগম বেশ হয়েছিল। সেদিন রাত্রে কিংবা পরেরদিন ভোরে বিঠ্ঠলজী, পরাশরজী সব কোলকাতা ফিরে এলেন। কেন জানি না আমি রয়ে গেলাম।

একটা জিনিস দেখেছি ভূমানন্দদেব যখনই চরণ দুটোকে মুড়ে গোমুখ আসন করে বসতেন তখন আগের ভূমানন্দদেব আর পরের ভূমানন্দদেবের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সেই পূর্বদেহ, পূর্বকান্তি এবং পূর্বভাব কোথায় উড়ে গেছে। এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি আসনস্থ। এ এক অন্যপুরুষ।

ইনি জগৎকে আলোড়িত করার ক্ষমতা রাখেন, উচ্চভাবের তরঙ্গ ওর থেকে ছড়িয়ে পড়ে, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়বাণী শুনিয়ে ম্রিয়মান ভক্তমণ্ডলীকে উজ্জীবিত করতে পারতেন। মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞান এঁর করতলামলকবৎ। এক মহাশক্তিমান পুরুষ ক্রমশ বিকাশ পেতে থাকেন।

ওঁর এই অবস্থাটা বর্ণনা করার মত ভাষা যেমন আমার নেই তেমনি শাস্ত্রজ্ঞানও নেই। তবে উনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাহ্যপূজা যত না করেছেন তার থেকে মনে হয় অনেক বেশি মানস পূজা করেছেন। কাউকে কাউকে বলেছেন, 'মনে কর, আমার রূপটি ঠাকুরের রূপ হয়ে গেছে, তারপর ঠাকুরের রূপটা গলে গিয়ে তোমার ইষ্টদেব হয়ে গেছে।'

ওর সামনে বসে থাকলে মন থেকে সকল বাসনা, কামনা, চিন্তা সব চলে যায়। তখন কোন ইচ্ছা থাকে না, অনিচ্ছা থাকে না, আকাঙ্খাও থাকে না। সব শান্ত, জগৎ শান্ত, স্থির ধীর। সৃষ্টি আছে, আবার সৃষ্টি

নেই। এমনকি ওঁর চিত্রপটের সামনে বসে থাকলে আজও অনেক ভক্ত এই অনুভূতি লাভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে আসানসোলের দেবুদা, শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী ভূমানন্দদেবের সঙ্গে কথা বলার একটা বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করেছেন। রোজই ভূমানন্দদেব পত্র দেন। সেই পত্র উনি রেখে দেন ওর শ্রীশ্রীঠাকুরের সিংহাসনের কাছে। উত্তরও পেয়ে যান অন্তরে।

ভূমানন্দদেব তাঁর বহু অন্তরঙ্গ শিষ্যকে সবিকল্প সমাধির কাছাকাছি অবস্থায় নিয়ে গেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন কি বোঝেন নি—আমরা জানি না। অবশ্য এইগুলো বোঝবার বিষয় নয়। বোধগম্য হবার বিষয়ও নয়। কারণ বোধের উদ্ভব হয় চিত্তচাঞ্চল্য থেকে। এ কথা বলা কারণ হচ্ছে অনেকেরই মূর্তিপূজা থেকে মহাকাশের ধ্যানে আপনা থেকেই মন চলে যায়।

বলতে ভুলে গেছি, ওঙ্কারনাথ শতাব্দী সমারোহের দ্বিতীয় দিন কিন্তু আমি ডাক পেয়েছিলাম বলবার জন্যে। তবে উনি বিষয়টা ঠিক করে দিয়েছিলেন —আজকের দিনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, বেশ ভয়ে ভয়ে মঞ্চে উঠেছিলাম। সময় একটু গড়াতেই ভয়টা গেল কেটে। উপলব্ধি করলাম Transmission of power হয়েছে।

শ্রোতাদের প্রশংসায় বুঝলাম ওঁর কৃপাতেই আমি উতরে গেছি। ওখানেই শুনেছিলাম চারু মজুমদারের বালিশের তলায় মাকালীর ছবি থাকত। শান্তামা উপস্থিত ছিলেন মঞ্চে। উত্তরাভিমুখী হয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে আসন নিয়েছিলেন। ওঁর ভাষণেই পেয়েছিলাম সেই বিখ্যাত উকুন মারার গল্পটা। জেনেছিলাম তর্ক বিতর্ক বা বাক্য বিন্যাসই ধর্ম নয়। উচিত অনুচিত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করা, সেই অনুযায়ী সকলকে বিচার করা, নূন্যতা ও হীনতা অনুযায়ী মেপে দেখাটাই ধর্ম। ধর্ম জীবন্ত বস্তু, একে দেখতে পাওয়া যায়, ছুঁতে পারা যায়।

বরেণ্যং ভর্গতে, কিঙ্কর সামানন্দজী অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছেন ঃ 'সীতারাম ভাব প্রবাহে ভূমানন্দ একটি নিঃশব্দ চেতনার নাম। প্রচ্ছন্ন অথচ অনিবার্য তাঁর অবস্থান। তিনি পাদ প্রদীপের আলোর সামনে আসেননি, আলো জ্বালিয়েছেন —তাকে রক্ষা করেছেন এবং আলো হয়ে গেছেন।'

ভূমানন্দদেব ইংরাজীর অধ্যাপক এটা সবাই জানেন। ক'জন আর জানেন শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁর ইংরাজীর প্রশংসা করতেন। অধ্যাপক পরাশরজী কন্যাকুমারীকায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরেছিলেন, নাবু'র (ভূমানন্দদেব) জন্মান্তরটা দাদু ব'ল, দাদু ব'ল (মানে কি একটু প্রমাণ দাও)। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, ওর ইংরাজীটা দেখেছিস্? আগের বারের মত।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটা উদাহরণ দেব। জয়গুরু পত্রিকার সম্পূজক ছিলেন কিঙ্কর কৃষ্ণানন্দজী। ওর কাছে শোনা। উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, রাজ্যপাল স্বয়ং পণ্ডিতব্যক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত। হঠাৎ উনি একটা ইংরাজীতে লেখা পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। কি ব্যাপার— ঠাকুরকে বলে দিতে হবে এই পাণ্ডুলিপিটা শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব হাতের লেখা কিনা?

ভূমানন্দদেবকে টেলিগ্রাম করা হল। কাম শার্প। উনি এলেন। পাণ্ডুলিপিটা ভাল করে পরীক্ষা করলেন, তারপরেই বলে দিলেন—এটা ঋষি অরবিন্দের নয়। সকলেই অবাক, কেমন করে বললেন উনি? নিজেই রহস্য উন্মোচন করলেন— শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজীতে এই সামান্য প্রিপোজিশনের ভুল হতে পারে না। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ভূমানন্দদেব যখন তখন শক্তিসঞ্চার করতে পারতেন। দীক্ষার জন্যে সবসময় তাঁর কাছে প্রার্থী হতে হত না। তিনি ইচ্ছা করলেই যে কোন লোকের মনটিকে উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে পারতেন।

একবার, তাও অনেককাল আগের কথা, ভূমানন্দদেব এসেছেন মহামিলন মঠে। কালটা সম্ভবত গ্রীষ্ম, আসন নিয়েছেন বর্তমান বিরক্ত সঙ্ঘের ঘরে। জানলা, দরজা সব বন্ধ। মাঝে-মাঝে জানলার ফাঁকফোকর দিয়ে নরম আলো ঢুকে সদানন্দদা'র মুখের

উপর পড়ছে। শুনেছিলাম ওর প্রাণটা খুলে গেছে। তাঁর ভালবাসা এবং আকর্ষণ শক্তি এত বেশি পরমাণে ছিল যে কেউ তাঁর সামনে উপস্থিত হলে তার মধ্যেও সেই ভাব সঞ্চারিত হয়ে যেত। তখনও এ.বি.জে.এস.-এর সম্পাদক ছিলেন। পরে পদত্যাগ করেন। আস্তে করে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। স্পর্শ প্রণাম করলাম। মনে হল জ্বলন্ত ভালবাসাকে স্পর্শ করলাম। কোথাও কোন কাঠিন্য নেই—'প্রেমময় মূরতি, জনচিত্তহারী' সামনে যেন আরও কারা কারা ছিলেন, কাউকে ভক্তির কথা বলছেন, কাউকে কর্মের কথা বলছেন, আবার পর মুহূর্তে বালকভাব। আমি যখন 'যুবক সঙ্ঘের' সারা রাজ্য সম্মেলনের কথা বললাম, তখন শিশুর মত বলে উঠলেন, 'এটা আমার কাজ, এটা আমার কাজ।'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে বুক ভরে গেছিল। তখনই ভেবেছিলাম যুবক সঙ্ঘের প্রথম রাজ্য সম্মেলন অত্যন্ত সফল হবে। আশীর্বাদ চেয়েছিলাম, আশীর্বাদ পেয়ে গেছি।

ভূমানন্দদেব সমস্ত বস্তুর ভেতর প্রাণকে দেখার কথা বলতেন। তিনি নিজেও তাই দেখতেন। বলতেন, যখন সকল বস্তুর ভেতরে প্রাণকে দেখা যাবে, চৈতন্যময় বস্তুর উপলব্ধি হবে, তখন ভাল-মন্দ, ছোট-বড়, উঁচু-নীচু ভাব আর কিছুই থাকবে না। প্রাণই হল ওঙ্কারবাদের মূল কথা।

'লীলাচিন্তা বড় লঘূপায়'---কথাটি প্রায়ই বলতেন। কিন্তু তাৎপর্য কি? বলতেন, সবই চৈতন্যময়, সবই জীবন্ত। সবই মধুময়, সবই প্রণম্য। তাই নাম আর প্রণাম। আর এই চৈতন্যময় বিকাশের নাম লীলা। এখানে না আছে সৎ না আছে অসৎ। লীলা উপলব্ধি করলে এসে হাজির হয় নিত্য। নিত্যই লীলা হয় আবার লীলাই হয় নিত্য।

সকলের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা ছিল। গীতাদির (অধ্যাপক অমল রায়ের সহধর্মিণী) ভাই শ্রীদিলীপ রায় একবার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। গীতাদি কোন উপায় না দেখে ভূমানন্দদেবের কাছে ভাইকে রেখে এলেন। আসলে ভূমানন্দদেব কারুর অসুখ হয়েছে শুনলে বা কোন খারাপ খবর পেলে স্থির থাকতে পারতেন না, ভীষণ অস্থির হয়ে পড়তেন। ভাবতেন, অসুখটা যেন তাঁরই হয়েছে, কিংবা খারাপ খবরটা যেন তাঁরই। দিলীপ রায়ের জন্য ভূমানন্দদেব নিজে দোকানে ছুটছেন ওষুধ কিনতে। নিজেই তাকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিচ্ছেন। যতক্ষণ না তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠছেন ততক্ষণই ভূমানন্দদেব অস্থির হয়ে থাকতেন।

অধ্যাপক পরাশরজীর সঙ্গে একবার রাণীগঞ্জ গেছি ভূমানন্দদেবকে দর্শন করতে। ভূমানন্দদেব তখন নতুন বাড়ীর দোতলায়। পরাশরজীকে দেখে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কী হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি—নিমাই গবু সব কোথায়? গামলা করে জল নিয়ে এস, গামছা নিয়ে এস। পরাশরজী যত সংকুচিত হচ্ছেন, উনি ততই প্রসারিত হয়ে গুরুবাড়ীর সন্তানের সঙ্গে গুরুবৎ আচরণ করে দেখাচ্ছেন।

ওঙ্কারনাথ শতাব্দী সমারোহে সারা রাণীগঞ্জ জুড়ে বিরাট উৎসব চলছে। সেই উৎসবে নগর সংকীর্তনে পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের দল এসেছিল। পুরোপুরি উদ্যোগ গ্রহণ এবং নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে তার ব্যয়ভার বহন করেছিলেন নিমাইদা। শিশুর সারল্যে বালকের মত আনন্দে নেচে উঠছেন আর জনে জনে ডেকে নিমাইদা'র প্রশংসা করছেন। শ্রীনামসংকীর্তনে লোকায়ত শিল্পের ব্যবহার বা প্রয়োগ তাঁকে খুব আনন্দ দিয়েছিল।

কথার কথায় উনি বলেছিলেন, আমার নাম করে (অমুককে) বলবে টিউশুনি করে মঠকে টাকা দিতে। আমি যে এখানটা ছেড়ে বেরুতে পারলাম না। ওদের (ট্রাস্টির) তো টাকার দরকার, বলেছিলাম রাজমাতা গায়ত্রীদেবীকে নিতে। উনি তো শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তা মহিলা বলে ওরা কেউ রাজী হল না।

কিঙ্কর কৃষ্ণানন্দজীর মুখে শুনেছি উনি ভীষণ স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। এই গুণটার জন্যে তাঁকে অনেকবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার কোন এক নির্যাতিতা, স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে বোঝাচ্ছিলেন, ভারতের আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শ।

আর্যনারীর আদর্শ। সেখানে সদানন্দদা উপস্থিত ছিলেন। মায়িটি সদানন্দদা'র পূর্ব পরিচিতও বটে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ করে সদানন্দদা বলে ফেললেন, মেয়েদের যদি সীতা, সাবিত্রী হতে হয় তাহলে ছেলেদেরকেও শ্রীরামচন্দ্র, সত্যবান হতে হবে। ব্যস্ শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে দশহাজার গায়ত্রী জপ করতে আদেশ করলেন। গুরুর অনুমতি ব্যতিরেকে কথা বলার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা।

তিনি আর সীতারাম যে দুই বিগ্রহ ন'ন—এ তত্ত্বে বহু ভক্তজনই যে বিশ্বাস করেন তাতে কোন ভুল নেই। সীতারামের জগৎ কল্যাণ যজ্ঞে নিমগ্ন ছিলেন বলেই তিনি একীভূত ছিলেন সীতারামের অখণ্ড সত্তায়।

তবে ভূমানন্দদেবের বন্দনা করতে গিয়ে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ভক্তির আতিশয্যে আমরা যেন কোন মিথ সৃষ্টি না করি। ওঙ্কারনাথদেবের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে যাঁরাই এসেছেন তাঁদেরই জীবন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। যত ছোট আকারেই হোক বা বড় আকারেই হোক। অধ্যাপক সদানন্দ থেকে কিঙ্কর ভূমানন্দ হয়ে ওঠাতে একটা দিব্যতার স্পর্শ সকলেই পেল। এটাই সীতারামের সবচেয়ে বড় প্রভাব। সবচেয়ে বড় সরলতা।

গুহাহিত (বললে অত্যুক্তি হবে না। গৌরী আশ্রমটা তো একপ্রকার গুহাই ছিল বলা যায়) দীর্ঘ জীবন। বাইরের জগতের কাজে কতটুকুই বা দিলেন তিনি। ঐ আশ্রমের মধ্যে থাকাতেই যেন তিনি ছিলেন সবার মধ্যে। বলা যাবে না যে তিনি গ্রামের লোক। তিনি একজন বিদগ্ধ নাগরিক। একজন গুরু। উনি দীক্ষা দিতেন, মানে শক্তি সঞ্চার করতেন। শক্তি সঞ্চার না হলে দীক্ষার কোন মানেই হয় না।

মাধব স্বামীজী বলেছিলেন, 'পরমহংস তুমি'। এক পরমহংস আর এক পরমহংসকে সহজেই চিনতে পেরেছিলেন। সীতারাম বলছেন, 'তোরে করিয়া যন্ত্র বিশ্বজননীর চলেছে যে অভিনয়, নেহারি মুগ্ধ দর্শকবৃন্দ গাহিতেছে জয় জয়।

সদানন্দ চক্রবর্তী ঃ টিচার অ্যাণ্ড স্কলার লিখলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, যে গ্রন্থ পাঠ করে সারস্বত সমাজ ধন্য ধন্য করে ওঠে। গ্রন্থটির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে উনি উপস্থিত থাকেন নি। অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তীর জীবনী লেখা কি সম্ভব? এদের জীবনী হয় না। প্রখ্যাত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ বলেছিলেন, এই জীবনগুলোকে নিয়ে স্বয়ং মহামায়া কীভাবে লীলা করেছেন তা দেখতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরও সেই ইঙ্গিত করলেন আমাদের কাছে যখন তিনি লেখেন—'**তোরে করিয়া যন্ত্র বিশ্ব জননীর চলেছে যে অভিনয়।**'

সদানন্দ চক্রবর্তী অর্থাৎ কিঙ্কর ভূমানন্দদেবের কি মন্ত্রলয় হয়ে গেছিল? এ প্রশ্নটা উঁকি মারে একটা ছোট্ট ঘটনায়। ভূমানন্দদেবের মাতৃদেবী কম্পিত হস্তে ওঁর কপালে তিলক এঁকে দিতেন। ভূমানন্দদেব গলিত হস্ত হয়েছিলেন কি না বলতে পারবো না, তবে নিজে যেমন চুল আঁচড়াতেন না, তেমনি পরণের কাপড়টাকে পর্যন্ত কোনদিন আমার বলতেন না। কত টাকা বেতন পেতেন—সেটাও জানতেন না। প্রশাসন বন্ধুর প্রতি অবিচার করেছে তার প্রতিবাদে সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে দিলেন।

কিঙ্কর কৃষ্ণানন্দ (জয়গুরু পত্রিকার শেষ সম্পূজক, তদ-দূরে-তদ-উ-অন্তিকের লেখক) ভূমানন্দের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। ওর কাছ থেকেই শুনেছি আধ্যাত্মিক জগতে ভূমানন্দদেব এমন এক উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন যা কল্পনারও বাইরে। ভ্রমর গুহা ভেদ করে ছিলেন।

আমাদের সম্প্রদায়ে আর একজনের নাম করতে পারি যিনি এই ভ্রমর গুহা অতিক্রম করেছিলেন। তিনি হলেন আচার্য্য বিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমাদের পরমপূজ্যপাদ মহারাজের পিতৃদেব। মধুমতী ভূমি পেরিয়ে এই ভ্রমর গুহা। কিঙ্কর সেবানন্দের কাছেও এর স্বীকৃতি পেয়েছি।

আরও শুনেছি তখন কৃষ্ণানন্দ অফিসের কাজ থেকে সবে অবসর নিয়েছেন। ভয়ংকর বিপদ।

অফিসারদের চক্রান্তে সমস্ত টাকাপয়সা আটকে তো গেছেই এমনকি মান সম্মানও যায় যায়। সদানন্দদার কাছে সব কিছু নিবেদন করা হল। উনি বললেন, চণ্ডীপাঠ করাও। চণ্ডীপাঠ যথারীতি শুরু হল। এমন সময় কোথা থেকে এক বিরাট কাল কুকুর এসে চুপচাপ বসে রইল অনুষ্ঠান স্থলে। চণ্ডীপাঠটা শেষ হতেই কুকুরটি চলে যায়। সদানন্দদা সব শুনে বললেন, ঐ দেখ মা নিজে এসে পাঠ শুনে গেছেন।

কৃষ্ণানন্দজী অচিরেই সেই বিপদমুক্ত হন। ছেলে বেলাতেই ভূমানন্দদেবের পূর্বজন্ম ভেসে ওঠে। চুঁচুড়ার দয়াময়ী মন্দিরে জগজ্জননীর সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর অট্টহাস্য নিজের কানেই শুনেছিলেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ লীলা দর্শন করেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যে স্বয়ং মহাপ্রভু সেদিনই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

লোক কপালে সীতারাম যেখানেই উপস্থিত থাকতেন সেখানে ভূমানন্দদেব উপস্থিত থাকলেও তাঁকে দেখা যেত এক কোণায় কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তিনি ছিলেন সদালাপী, বিনম্র ও প্রসন্ন। যুবক সঙ্ঘের প্রথম সম্মেলন। অনুষ্ঠানের দিন মঞ্চ আলো করে ত্যাগী যুবকভাইরা সব বসে আছেন। সে এক দৃষ্টিনন্দন শোভা। তাঁরই প্রযত্নে, তাঁরই প্রেরণায় প্রায় তিরিশটি ছেলে সংসার ছেড়ে বেড়িয়ে এসে 'হলদে বস্ত্র' গ্রহণ করেছেন। আজ তারা দিকে দিকে সীতারাম ভক্তি আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করছেন। এমন সুন্দর সুসংস্কৃত চেতনায় তাদের সংস্কৃত করে গেছেন যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেই নন্দনের বিভায় তাদের মাধুর্যমণ্ডিত শ্রীতনু দেখে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়।

মহাভারতে গুরু দ্রোণকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, পুত্রের প্রতি দুর্বলতায় আপনি অধর্মের সাথে সাথ দিয়েছেন। পুত্রকে আপনি অনেক কিছুই দিয়েছেন কিন্তু দেননি সংস্কার, দেননি ধর্ম। তাই এবারের লীলায় গুরু ভূমানন্দদেব, তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরাই এসেছেন, সে ছাত্র হোক্, ছাত্রী হোক্, শিষ্য হোক্, শিষ্যা হোক্, প্রত্যেককেই সংস্কার দেবার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন 'ধর্ম' দেবার। ওঁর কাছে যাঁরা হলুদবস্ত্র/ত্যাগবস্ত্র নিয়েছেন বা পেয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে তাঁর একটা বিশ্বাস—এরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঠাকুরের কাজ করবে, কিছুতেই এরা বিচলিত হবে না।

তিনি ছিলেন যোগী, যোগীর একটা লক্ষণই হল নিজেকে বাইরে নিয়ে দেখা। আর সেখান থেকে যখন উনি কলম ধরতেন, ঠাকুরের বিষয়ে লিখতেন, তখনি আমরা 'নগ্ন ভূমানন্দ'দেবকে পেয়ে যেতাম। যেখান থেকে উনি উচ্চারণ করতেন—

হে গুরো! হে শঙ্কর!

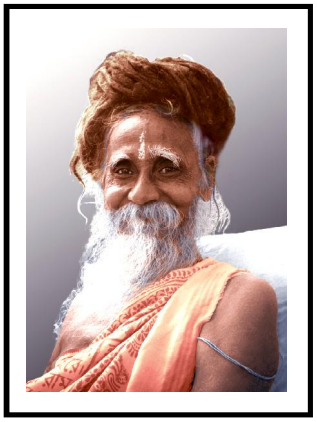

অথ চাতুর্মাস্য উল্লাস

শ্রী প্রদীপ দাস

অথ মঙ্গলাচরণঃ

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদগুরু শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অনুবাদ ঃ আমার যিনি রক্ষাকর্তা তিনি জগতের রক্ষাকর্তা। যিনি আমার গুরু তিনি জগতের গুরু। যিনি আমার আত্মা, তিনিই সর্বভূতের আত্মা। অতএব সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি।

প্রথম বল্লী ঃ

অদ্য হইতে সাড়ে পাঁচশত বৎসরে পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চাতুর্মাস্য প্রবর্তন করেন। তিথিনুযায়ী চাতুর্মাস্য সমারম্ভ হয় শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি হইতে শ্রীরাস পূর্ণিমায় চাতুর্মাস্য সমাপন হয়। শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বাংলা ধন্য, বাঙালি ধন্য, ভারত ধন্য, ভারতবাসী ধন্য, বিশ্ব ধন্য, বিশ্ববাসী ধন্য। মনে হয় এখনও তাঁহার পদরজঃ মিশিয়া রহিয়াছে ভারতের আকাশে-বাতাসে, এখনও তাঁহার অঙ্গগন্ধ মিশিয়া রহিয়াছে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের অঙ্গে। তাঁহার ভাবধারা প্রচারিত এবং প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে ধীর সন্তর্পণে অথচ অপ্রতিহত গতিতে সমগ্র বিশ্বে। এ যে কত বড় গৌরবের তাহা ভাবিবার, বুঝিবার এবং হৃদয়ঙ্গম করিবার। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজীবন গঠিত হয়েছে ত্যাগ-তিতিক্ষার বৈরাগ্য পথে, প্রেম মন্দাকিনীর পথে। পঞ্চসাধনই যথা- কঠোরতা, সংযমশীলতা, ভোগ নিঃস্পৃহতা, ত্যাগ-বৈরাগ্যই-চাতুর্মাস্য, মাধ্যমে অনুশীলন প্রতিভাত হয়। ইহাই ছিল গৌরাঙ্গের পথ। বেঙ্কট ভট্ট ছিলেন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী 'শ্রী' সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক। দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ সময়ে ইঁহারই আগ্রহে প্রভু ইঁহার গৃহে চাতুর্মাস্যকাল অবস্থান করেন। ইঁহার সঙ্গে প্রভুর সখ্যভাব জন্মিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবার সমগ্র বিশ্বের কল্যাণে সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া ক্ষুদ্র সংসার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ তাঁহার প্রদর্শিত ত্যাগের পথ এবং সর্বতোভাবে ভোগবিলাস ত্যাগ তাঁহার পথ ঃ

'কঠোরতা কত তাঁহার জীবনে
করিয়া দেখান নিখিল ভুবনে
সন্ন্যাসী হ'লে ত্যাগের বিধানে
জীবন কেমনে গড়িতে হয়।
তাই তো কলার শরলে শয়ন
উপাধান হীন তেল-বরজন
বর্জিবিষয়ী বিষ-সঙ্গম
সদাই ইষ্ট ভাবনাময়।'

তৈল বর্জন তাঁহার কঠিন কঠোর পথ। তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি ঃ

'সন্ন্যাসীর নাহি কভু তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥'

স্ত্রীসঙ্গী-সঙ্গ বর্জনই তাঁহার পথ—

'বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট মন।
তাহাতে না হয় কভু শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ॥'

এ তাঁহারই উপদেশ

প্রকৃতি সম্ভাষণ বর্জন তাঁহার পথ। তাঁহার কঠিন—কঠোর বাণী—

'বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥'

সর্বতোভাবে আত্মাভিমান ত্যাগ-দীনভাব গ্রহণ তাঁহার পথ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমনিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণ হইতেও নিজেকে ছোট বলিয়া ভাবা, তরুর মত সহিষ্ণু হওয়া, নিজে মানের কাঙাল না হইয়া অপরকে মান দেওয়া—ইহাই তাঁহার পথ।

'সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥'

গৌরাঙ্গের পথ ত্যাগ, তিতিক্ষা, সেবা ও বিশ্বপ্রেমের পথ, সরল মসৃণ অথচ বড়ই পিচ্ছিল।

ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির ধারণস্তম্ভ ব্রহ্মীভূত জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ যোগানন্দ আন্তনির্দেশে গত ২৮শে আষাঢ় (ইং ১৩।৭।২০০৩) রবিবার গুরুপূর্ণিমা তিথি হইতে ২৪শে ভাদ্র (ইং ১০।৯।২০০৩) বুধবার ভাদ্রীপূর্ণিমা প্রথম পর্যায়ে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মাতারাঙ্গী, বারাসাত সন্নিকটস্থ ঁশ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দির, সাঁইবোনা, পোঃ মালিকাপুর, পিন-৭৪৩২০৩, দূরাভাষ ২৭০৭৪৯১১, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ বরুথপ উপগোপালরূপে পরিচিত রুদ্ররামজী প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর বল্লভপুরস্থ রাধাবল্লভজীর, খড়্‌দহের শ্যামসুন্দরজীর এবং সাঁইবোনায় নন্দদুলালজীর বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দিরে প্রথম পর্যায়ে দুইমাসব্যাপী চাতুর্মাস্য মহাব্রত যজ্ঞ, অখণ্ড তারকব্রহ্মনাম, শ্রীশ্রীগুরুগীতা, বিষ্ণুসহস্রনামদিশাস্ত্র পাঠ ও নানা দিব্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবর্তন করেন শ্রীগুরুদেবের ত্রিদণ্ডিস্বামী ঁপরাঙ্কুশ রামানুজজীয়র। ২৫শে ভাদ্র (ইং ১১।৯।২০০৩) বৃহস্পতিবার হইতে হুগলি জেলার রামানন্দ মঠে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২১শে কার্তিক (ইং ৮।১১।২০০৩) শনিবার রাসপূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত দুইমাসব্যাপী চাতুর্মাস্য মহাব্রত যজ্ঞের পরিসমাপ্তি ঘটে। ৩০শে আষাঢ়, ১৪১৮ (ইং ১৫।৭।২০১১) শুক্রবার আষাঢ়ী পূর্ণিমা ও গুরুপূর্ণিমা ঁশ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দিরে কর্মকুঞ্জ-র সঞ্চালক ও মঠাধীশ কৃত সংকল্প এবং তথাকথিত পরমপূজ্যপাদ বিঠ্‌ঠল রামানুজ মহারাজ অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায় সর্বাধীশ আশীর্বাদান্তে এবং পাশাপাশি 'যুবক সংঘ'-এর উদ্যোগ গ্রহণ মাধ্যমে মন্দিরে চাতুর্মাস্য উদযাপিত হয়। প্রত্যহ নামসংকীর্তন চলে। স্থানীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত গুরুভাই-বোনের প্রত্যহ দিনধার্য্য করে নামসংকীর্তন অংশে যোগদানের মাধ্যমে নামসুন্দরকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার প্রয়াস অব্যাহত রাখে। ঁশ্রীশ্রীনন্দদুলাল ও রাধারাণীকে কেন্দ্র করে 'যুবক সংঘের' ভক্তগণ বিভিন্ন প্রান্তে গুরুভ্রাতা-ভগ্নিদের বাড়ী নির্দিষ্ট সময়সূচী নির্ধারণ করে 'নাম' প্রচার করেন।

সুদূর 'শ্যামাশঙ্কর মঠ' অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায় ভুবনেশ্বর শাখা, ১৩৮০ সাল। মহাতব রোড, পোঃ ও জেলা- ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা। ভুবনেশ্বর স্টেশন হতে অটোতে ৬ কিমি. লিঙ্গরাজ মন্দিরের নিকট। পুরীধাম ভুবনেশ্বর বাসরোডে ভুবনেশ্বর শহর রবি টকিজ হতে ১ কিমি। লিঙ্গরাজমন্দিরের পশ্চিমদিকে বড় পোষ্ট অফিসের বিপরীত। ফোন ঃ ০৬৭৪-২৫৯১৩৫৪ মঠাধীশ পরম পূজনীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শঙ্কর গাঙ্গুলী, আমাদের 'দাদা' নামে পরিচিত, আহ্বানে 'চাতুর্মাস্যের' মধ্যে একমাস উক্ত মঠে পালিত শেষ দুইদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত ভক্ত এবং 'যুবক সংঘের' ভ্রাতাভগ্নিগণ দুইদিন বিভিন্ন পক্রিয়া এবং পালা করিয়া নামসংকীর্তন পরিসমাপ্তি বা জয় দেওয়া হয়। ৩৪জন ভক্তবৃন্দ নিয়ে হাওড়া হইতে শুভযাত্রা ছিল (ইং ১২।৮।২০১১)। ভুবনেশ্বর পর্যন্ত ট্রেনে 'নাম' চলতে থাকে। মঠে প্রসাদ ও থাকিবার সুবন্দোবস্ত আছে। ইং ১৪।৮।২০১১ মধ্যাহ্নে উক্ত মঠে মহতী ধর্মসভা মাধ্যমে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলীদাদা স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীযুক্ত মহান্তি মহাশয়, শ্রীশম্ভুদা এবং যুবকসংঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নয়ন সাধু, উক্ত সভা আমাদের প্রিয় নয়নকে এবং তিনজনকে একটি করে মানপত্র দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। ঐদিন প্রাতে সমবেতভাবে খোল, করতাল, হারমোনিয়ম সঙ্গে নিয়ে উচ্চশিক্ষিত এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী, ছাত্রাবস্থায়ই গান্ধীজী, বিপিন পাল প্রভৃতি দেশনায়কের সান্নিধ্যে আসায় দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন শ্রীশ্রীঠাকুর গঙ্গনন্দজীর প্রতিষ্ঠিত 'সদ্‌গুরু' আশ্রমে একঘণ্টা নাম চলল। নামসিদ্ধ পরমপ্রেমী গঙ্গানন্দজীর মহাত্মা সন্তদাস বাবাজী, মা আনন্দময়ী, ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, প্রভুপাদ প্রাণকিশোর

গোস্বামী, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, শিশির ব্রহ্মচারী, বঙ্কিম সেন, অক্ষয়নাথজী প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী-সিদ্ধ মহাপুরুষগনের সঙ্গে তাঁর নিবিষ্ট যোগাযোগ ছিল। কাশীধামে নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী মহারাজের তিনি ছিলেন কৃপাধন্য।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভু ভক্তিকল্পতরুর একটি প্রধান স্কন্ধ। পঞ্চতত্ত্বের একতম। তিনি হইলেন মহাবিষ্ণুর কারণ। নবশায়ীর অবতার, ভক্ত অবতার। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার প্রেম হুঙ্কারেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব। সদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নীলাচলে 'জটিয়াবাবা' নামে সুপরিচিত। তিনি শ্রীশ্রীঅদ্বৈত্যাচার্য্য মহাপ্রভুর অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ এবং তাঁহার শিষ্য পরম্পরা হইলেন শ্রীশ্রীগঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ধরায় অবতীর্ণ হন শ্রীশ্রীঅদৈত্যাচার্য্য মহাপ্রভু; চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন নিমিতে উহার সৃষ্ট শিষ্টাচার শ্লোক নিবেদন করলেন—

'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্দিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।'

পূর্ব আলোচনায় ফিরে আসা যাক। হারানো সূত্র যাহা আরেকটি জগতের শুরু, যে কথা পড়তে জানা দরকার, যাহা অতীতের সন্ধানে প্রথম যাত্রা। বর্তমান বাংলা ১৪২১ বর্ষে প্রথম পর্যায়ে দুইমাসব্যাপী (১২ জুলাই হইতে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪) শেষ দুইমাস শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দিরে ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে ৬ই নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে।) মহামিলন মঠে চাতুর্মাস্য চলিতেছে।

দ্বিতীয় বল্লী ঃ

অথ চাতুর্মাস্য ব্রতবিধান

সঙ্কলক-শ্রীশ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ (আত্মানন্দজী মহারাজ)।

শাস্ত্রে এই চাতুর্মাস্যের ব্রতের সকাম ও নিষ্কাম ভেদে বিভিন্ন ফলপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে। অবগতির জন্য তন্মধ্যে কতিপয় উদ্ধৃত করা হইতেছে। যথা-

১। চাতুর্মাস্যব্রতে যোগাদির উন্নত সাধনার অভ্যাসে বা সাধনা প্রকৃত জ্ঞানালোচনায় যে কোন যোগসিদ্ধি ও মুক্তি লাভ হয়—ইহাই এই ব্রতের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, মুমুক্ষ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, সাধু, বাণপ্রস্থী সন্ন্যাসীরাই শুদ্ধান্তকরণে এইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন।

২। পকান্ন ত্যাগে, দেহ-মন পাপহীন হয়।

৩। দুগ্ধ দধি ত্যাগে, গোলক প্রাপ্তি হয়।

৪। দেবমূর্তির ও মন্দির উপলেপন মার্জনাদির দ্বারা সততঃ মন্দির পরিচ্ছন্ন রাখিলে বিষ্ণু আদি দেবলোকবাসের উপযোগী পুণ্য লাভ হয়।

৫। প্রস্তর-পাত্রে ভোজন করিলে, সতত প্রয়াগ-স্নানজনিত ফললাভ হইয়া থাকে।

৬। নখ-লোখাদি ধারণে, মুক্তিপ্রদ নিত্য গঙ্গাস্নানের ফলপ্রাপ্তি হয়।

৭। বিষ্ণুপাদ বন্দনে গোদানজ পুণ্য লাভ হয়।

৮। পত্রে ভোজন করিলে, কুরুক্ষেত্রবাসের ফল লাভ হয়।

৯। ভূমিতে শয়ন করিলে বিষ্ণু অনুচর হইবার পুণ্য লাভ হয়।

১০। ভূমিতে ভোজনে রাজত্ব লাভ হয়।

১১। মৌন থাকিলে বাক্‌সিদ্ধ হয়।

১২। 'নমো নারায়ণ' মন্ত্র জপে অনশন ব্রতের ফলস্বরূপ পুণ্য সঞ্চিত হয়।

১৩। একদিন অন্তর একদিন ভোজনে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির অনুকূল্য পুণ্য লাভ হয়।

১৪। মধু-মাংসাদি বর্জনে মানব ঋষির ন্যায় যোগী, জ্ঞানী ও আধি-ব্যাধিহীন তেজস্বী হইয়া থাকে।

১৫। তৈল বর্জনে সৌন্দর্য্য।

১৬। কটু তৈল ত্যাগে শত্রু নাশ।

১৭। স্থালী পাক্ (হাঁড়ীর রান্না) অন্ন আদি ত্যাগে বংশবৃদ্ধি।

১৮। গুড় ত্যাগে স্বরের মধুরতা।

১৯। তাম্বুল ত্যাগে বহু ভোগ্য লাভ।

২০। ঘৃত ত্যাগে লাবণ্য।

২১। ফল ত্যাগে বুদ্ধি লাভ।

২২। শাক পত্রাদি ত্যাগে বহু পুত্রলাভ।

২৩। সর্ববিধ ডাল ত্যাগে বা মাসকলাই ত্যাগে রোগহীন ও সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়।

২৪। অন্নত্যাগে সন্তান দীর্ঘজীবী হয়।

২৫। মাংসাদি আমিষ বর্জনে কৃর্ত্তি, আয়ু, যশ ও বল লাভ হয়।

চাতুর্মাস্য ব্রতানুষ্ঠানের বিধিনিষেধ

১। এই ব্রতানুষ্ঠানের ব্রতানুষ্ঠানকালে নিত্য প্রাতঃস্নান কর্তব্য। কেশ শুদ্ধান্তকরণে পবিত্রভাবে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া যথাবিধি নিত্যকর্ম করিতে হয়। শ্বেতসীম, বরবটি, কলমীশাক, ডুমুর, কদবেল এবং এতদ্ব্যতীত কাহার কাহার মতে পটল ও লেবু খাইতে নাই।

এই ব্রত আরম্ভের দিনে যথাবিধি নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক শ্রীগুরু ও অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর চাতুর্মাস্য ব্রতের সংকল্প করিবে যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আষাঢ়িমাসি (শ্রাবণে মাসি) শুক্লপক্ষে গুরুপূর্ণিমায়াং তিথৌ (কিংবা অমুক তিথৌ যথা দ্বাদশী ইত্যাদি) আরম্ভ চাতুর্মাস্যাং যাবৎ অমুক গোত্রঃ অমুক দেবশর্মা (অমুক গোত্রঃ অমুক দাসঃ অমুক গোত্রা অমুকী দাসী) শ্রীভগবদ্ প্রীতিকামঃ (মোক্ষকাম) চাতুর্মাস্য ব্রতমহং করিষেৎ।

পরে সংকল্প সূক্ত পাঠান্তে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা-

ইদং ব্রতং ময়াদেব গৃহিতং পুরতস্তব।
নির্বিঘ্নং সিদ্ধিমাপ্নোতু প্রসাদাত্তব কেশবঃ।।
গৃহিতেঽস্মিন্ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণত্যহং প্রিয়ে।
ত্বন্মে ভবতু সম্পূর্ণং তৎ প্রসাদাজ্জ মার্দ্দনঃ॥

অতঃপর বেশ সংযত অন্তরে প্রত্যহ নিয়মিত ইষ্টগুরুব চিন্তাসহ যথাযথভাবে ব্রতপালন রত থাকিবে। ব্রতপালন সমাপন দিবসে, গণেশাদি পঞ্চদেবতার ও গুরু-ইষ্ট পূজান্তে নারায়ণের যথাশক্তি অর্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিভাবে মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা-

ওঁ (অথবা নমঃ) ইদং ব্রতং মায়াদেব তব প্রীত্যৈকৃতংপ্রভো।
নূনং সম্পূর্ণতাং যাতু তৎপ্রসাদাজ্জনার্দন।।

দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাব ধারণ করিয়া শ্রীগুরু ও সাধুভোজন করাইবে।

ইতি চাতুর্মাস্য ব্রতবিধি
('পুরশ্চরণ প্রদীপ')

ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত 'দেবযান পত্রিকা' পঞ্চত্রিংশ বর্ষ। একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা। আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৯০ পৃষ্ঠা ৪০৭ এবং ৪০৮ হইতে সংগৃহীত।

উপসংহার ঃ ধর্মে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং।
তস্মাৎ ধর্মং পরমং বদন্তি।।

লেখা পাঠানোর সময়ে একটু খেয়াল রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে আঠায় মূল পাণ্ডুলিপি জড়িয়ে না যায়। জড়িয়ে ছিঁড়ে গিয়ে লেখাটির মর্যাদা হানি হচ্ছে।

জীবন খাতার পাতায় পাতায়

শ্রী জয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়

(৪)

বালীর কেদারভবনের সুশীলদা (শ্রীযুক্ত সুশীল মুখোপাধ্যায়, আমাদের ঠাকুর যাঁকে তাঁর পূর্বজন্মের বাবা বলতেন সেই শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়ের ছোটভাই (এঁকে আমাদেরঠাকুর আদর করে কাকামণি বলতেন) একদিন বাড়ীতে এসে আমাকে বলে গেলেন যে 'ঠাকুর আমাদের দুইভাইকে (অশোক, জয়ন্ত) ডেকেছেন বালীতে কেদারভবনে, আমাদের তিনি কিছু বলবেন। সুতরাং পরদিন যেন আমরা অবশ্যই গিয়ে দেখা করি।' ঠাকুর ডেকেছেন, সুতরাং আনন্দে ডগমগ হয়ে পরদিন আমরা দুজনে গেলাম। ঠাকুর তখন অজ্ঞাত বাসে অন্যত্র। আমাদের নিয়ে শ্রদ্ধেয় পদ্মলোচনদাদা ও সুশীলদা বসলেন। ওঁরা বললেন, 'তোমরা সোনামণির সঙ্গে মেশামেশি করছ খবর আছে। ঠাকুর এ ব্যাপারে তোমাদের কি বলছেন শোন।' এই বলে তাঁরা আমাদের সামনে একটি টেপরেকর্ডার রাখলেন এবং সুইচ টিপে টিপে ঠাকুরের সঙ্গে ভক্তদের কথোপকথনের নির্বাচিত অংশটিম নির্ধারণ করে আমাদের শোনালেন। ঠাকুর বলছেন--- সোনামণি গেরুয়া নিয়েছে, 'একে' ত্যাগ করেছে। জয়ন্ত অশোক ছোটছেলে, ওদের সোনামণির সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত, নচেৎ ওদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা। আমাদের সম্পর্কে ঠাকুরের ইচ্ছা বা নির্দেশ শেষ হল।

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটা আমরা স্তম্ভিত হলাম। সোনামণিদার অমন দরদ দেওয়া প্রাণঢালা নাম, অমন আবেগ মথিত ঠাকুরকথা আমাদের সকলের কাছেই ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণের বস্তু। তাঁর সম্বন্ধে ঠাকুরের ঐ নির্দেশ হতে পারে—তখন আমরা ভাবতেও পারছি না। এখানে একটা কথা পুনরায় বলি, সোনামণিদা ঠাকুরের সঙ্গ ত্যাগ করলেও ঠাকুর তাঁর কাছে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার পুরুষ , ঠাকুরের ভালবাসার কথা বলতে বলতে তাঁকে অঝোরে কাঁদতে দেখেছি। যাইহোক, ফিরে আসার পথে আমরা ধাতস্থ হলাম এবং এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে ঠাকুর যখন চান না তখন আমাদের সকলকে সোনমণিদার সম্পর্ক ছাড়তেই হবে এবং তা অবিলম্বেই। বাড়ীতে এসে মা, ছোট জ্যাঠাইমা (শ্রীমান অশোকের মা) ও আমরা দুভাই আলোচনা করলাম। আমাদের বাবারাও শুনলেন। সকলেই একমত যে ঠাকুর যখন বলেছেন তখন আমাদের সেইরকমই করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল কে বলবে সোনামণিদাকে। আমরা দু'ভাই ঠাকুরের কথা শুনে এসেছি। সুতরাং আমাদের দুজনের মধ্যেই কাউকে বলতে হবে। শ্রীমান অশোক প্রথমেই বলে দিলে সে একথা বলতে পারবে না। মন খুবই খারাপ, এতদিনের সঙ্গ, সুতরাং বলতে না চাওয়ার পিছনে মানসিক অবস্থাটা অনুধাবন করা যায়। এই অবস্থায় সোনামণিদাকে বলার ভার আমার ওপরই বর্তালো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সোনামণিদা যথারীতি এসে বসেছেন, বাড়ীর সকলের সামনে আমি ঠাকুরের কথাটি হুবহু তাঁকে বলে গেলাম। এমন তেজী বাজখাঁই গলার মানুষ চিত্রার্পিতের মতো বসে রইলেন কিছুক্ষণ। যেন অকস্মাৎ আঘাতে বহির্গতপ্রাণ একটা নিথর নিস্পন্দ দেহ। একটু পরে সোনামণিদার গলা ফুটল। বললেন 'বল আবার বল কি বলেছেন ঠাকুর', বললাম। এবার সোনামণিদার চোখে নামল অশ্রুর শতধারা। কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ সোনামণি ঠাকুরকে ত্যাগ করেছে কিন্তু ঠাকুর কি একবারও বলেছেন যে তিনি সোনামণিকে ত্যাগ করেছেন?' জিজ্ঞাসা করছেন, সুতরাং বললাম, 'না ঠাকুর তা বলেন নি।' এবার সোনামণিদা মা-জ্যাঠাইমাকে বলতে লাগলেন, 'দেখো রাণুমা (আমার মা), ইলা মা (শ্রীমান অশোকের মা) ঠাকুর একবারও বলেন নি যে তিনি সোনামণিকে ত্যাগ করেছেন। আমি তাঁকে ত্যাগ করতে পারি কিন্তু তিনি আমাকে ত্যাগ করতে পারেন না।' কি বলব! আমরা সকলেই নীরব।

Highly sentimental situation—সকলেই অভিভূত। কিন্তু এর মধ্যে এটা পরিষ্কার যে এ বাড়ীতে সোনামণিদার আসার ওপর পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সোনামণিদা উঠে পড়লেন। তাঁর আসায় যবনিকা পড়ল এবার।

সোনামণিদার অঙ্ক আমাদের জীবনে মূলত এইখানেই শেষ। তবে শেষ হয়েও একটু বাকী রইল। আর একটি ঘটনার মধ্যে আমাদের ঠাকুর প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা বলে ইতি টানার পূর্বে সোনামণিদার বাড়ীতে আসা, নাম করা ইত্যাদি নিয়ে আমার যেমন মনে হয়েছে তা একটু বলি। আমার বিশ্বাস সোনামণিদার আসা, নামের স্রোতে প্লাবন আনা, ঠাকুরের কথা বলা, একাদশীতে আমাদের উদয়-অস্ত মৌন নেওয়ানোর পশ্চাতে ছিল সূক্ষে ঠাকুরের ইচ্ছা। তিনি বলেছিলেন, এ সবই হচ্ছে ঠাকুরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এরপর তিনি আসবেন —এখন মনে হয় কথাটি ঠিক। যখন আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না ঠাকুর কোনওদিন বাড়ীতে আসতে পারেন, সে সময় সোনামণিদা জোর দিয়ে বলেছিলেন ঠাকুর আসবেন, একবার নয় অনেকবার। তাঁর এখানে আসাটাও ঠাকুরের ইচ্ছা, না হলে এভাবে নাম শুরু হত না। পরে সোনামণিদার এখানে যখন ফুরোল ঠাকুর তখন আমাদের সরাসরি নির্দেশ পাঠালেন তাঁর সংস্রব আমাদের ত্যাগ করতে।

এরপর সময়ের নদীতে অনেক জল বয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন সোনামণিদার সঙ্গে দেখা আমাদের চাতরারই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তাশ্রমে। খুব দুঃস্থ অবস্থা, সম্ভবত রোগগ্রস্তও, কোনরকমে মাথা গোঁজবার ঠাঁই পেয়েছেন সেখানে। কিভাবে যে তাঁর দিন চলছিল তা সহজেই অনুমেয়। এরপর তাঁর প্রয়োজনেই কয়েকবার দেখা করতে হয়েছে তাঁর সঙ্গে—কখনও সেই ভক্তাশ্রমে, পরে বৈদ্যবাটীতে কোনওরকমে খেটে খাওয়া তাঁর ছেলে আস্তানায়। এরই মধ্যে একবার দেখা হয়ে গেল শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে। এখন সেই কথায় আসি।

আমার ছোট জ্যাঠামশাই অর্থাৎ শ্রীমান অশোকের বাবা, হাঁটুতে আঘাত লেগে ঐ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁকে দেখতে গিয়ে শুনলাম সোনামণিদাও রয়েছে ঐ একই হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে। সুতরাং গেলাম তাঁকে দেখতে। তিনি খুব খুশী। একথা সেকথার পর বললেন 'জয়ন্ত যদি পারো তো ঠাকুরকে আমার কথাটা একবার বোলো।' ঠাকুর তখন এই বাংলাতেই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন। বললাম 'যোগাযোগ হলে বলার চেষ্টা করব।' যখন বলেছিলাম তখন জানি না সত্যিই ঠাকুরের সঙ্গে অত তাড়াতাড়ি যোগাযোগ হয়ে যাবে।

দু-একদিনের মধ্যেই ঠাকুর এলেন ডুমুরদহে। গেলাম দর্শনে। প্রচণ্ড ভীড়। সেদিন আবার রাতে সেখানে শ্যামসঙ্ঘের অভিনয়, সম্ভবত নদীয়ানাগর। ঠাকুর উপস্থিত থাকবেন সেই অনুষ্ঠানে, অভিনয় দেখবেন। সুতরাং সারাদিনরাত্রি ব্যাপী কর্মসূচী। তখন বেলা দুপুর, ঠাকুর ব্রজনাথ বাড়ীতে। বাড়ীর একতলায়, চতুর্দিকে প্রচণ্ড ভীড় জমাট বেঁধে আছে। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে মাছি পর্যন্ত গলার উপায় নেই। কড়া পাহারা। কি করে যে ঐ ভীড় ঠেলে ঐ কড়া পাহারা ভেদ করে ওপরে ঠাকুরের কাছে পৌঁছালাম জানি না। ঠাকুর দর্শন করে আমার মন ভরে গেল—ঠাকুর হেসে মাথায় তাঁর শ্রীহস্ত রাখলেন, বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। এইসময় সোনামণিদার কথা তাঁর কাছে জানালাম। তাঁর কথায় ঠাকুর খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি ইত্যাদি শুনে ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন যাব সোনামণিকে দেখতে হাসপাতালে, তুই নীচে রাস্তায় গিয়ে গাড়ীর কাছে দাঁড়া। গাড়ী অর্থাৎ ঠাকুরের রথ। আমি তাড়াতাড়ি ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এলাম ব্রজনাথবাড়ী থেকে। ঠাকুর যে ঘরে ছিলেন তার জানলার নীচেই ঠাকুরের গাড়ী দাঁড়িয়ে। সুতরাং আমি সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠাকুর বলেছেন এখুনিই বেরিয়ে পড়বেন। ওপরেও খুব ভীড় দেখে এসেছি। ঠাকুরকে ঘিরে বহুকণ্ঠের কলকাকলি কানে আসছে।

একসময় রব উঠল ওপরে, ঠাকুর এখন বেরুবেন, শ্রীরামপুর যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে ওপরে একটা আলোড়ন পড়ে গেল। অনুমান করি ঠাকুর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। এরমধ্যে শুনতে পেলাম শ্যামসঙ্ঘের শ্যামলদা'র গলা। আড়িয়াদহের শ্যামলদা, ঠাকুরের নাতজামাই। ঠাকুরের এই বেলা গড়িয়ে যাওয়া সময়ে বেরুনোর উদ্যোগে অনুযোগ জানাচ্ছেন ঠাকুরের কাছে। শ্যামলদার দিক থেকে যুক্তি ন্যায্য। তাঁরা অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন সন্ধ্যার পর। সব উৎসাহের মূল স্বয়ং থাকবেন বলে। সেই ঠাকুরই যদি এইসময়ে কোথাও যান তবে তাঁদের এত ব্যবস্থা তো ব্যর্থ

হয়ে যাবে। ঠাকুরের বেরুনো তো কারুর অজানা নয়! একজনকে এক জায়গায় কৃপা করতে গিয়ে কতজনকে কত জায়গায় কৃপা করতে যাবেন আর কখন ফিরবেন তাঁর ঠিক নেই। তাই ঠাকুরের কাছে এ অনুযোগ।

তিনি যে কৃপাসার, সকলকে কৃপা করতে তাঁর যতখানি আগ্রহ, তাঁর সেই কৃপা গ্রহণ করতে তত আগ্রহী আমরা নয়। তাই কৃপা বিতরণের জন্যই তিনি ঘুরতেন দ্বারে দ্বারে। তাঁকে পরিত্যাগ করলেও তাঁর পরিত্যাগী ছেলেকে তিনি পরিত্যাগ করতেন না। সেই কারণে তাঁর কাছে অন্যান্য ছেলেদের মতো তাঁকে যে ছেলে ছেড়ে চলে গেছে তারও কৃপালাভের সমান অধিকার। রাস্তার ওপর ঠাকুরের তৈলযানের পাশে দাঁড়িয়ে ঠাকুরবাড়ীর দোতলা থেকে ভেসে আসা ভক্তদের কলকাকলি শুনতে শুনতে হঠাৎ কানে এলো ঠাকুরের রাগমিশ্রিত কণ্ঠস্বর, তাঁকে ঘিরে বহুকণ্ঠের গুঞ্জন স্তিমিত এখন। ঠাকুর বলছেন—'এ'র একটা ছেলে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে, তাকে দেখতে যাব না তোমরা সব আনন্দ করবে বলে? সকলেই চুপ। ঠাকুরের রাগের অভিনয় সঙ্গে সঙ্গে শেষ। পুনরায় বললেন শান্তস্বরে সান্ত্বনা-আশ্বাস দিয়ে—তোমরা অভিনয়ের ব্যবস্থা কর না, এ তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। ঠাকুরের আশ্বাসে অভিনয়ের ব্যবস্থাপক ছেলেরা খুশী, যাঁরা ঠাকুরের সঙ্গে রাতের অভিনয় দেখার আগ্রহী তাঁরাও খুশী। ঠাকুর এবার বেরিয়ে পড়লেন। গাড়ীতে ঠাকুর শ্রীচরণ একদিকে প্রসারিত করে বসে। আমি তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে সীটের নীচে আধবসা অবস্থায় কারণ স্থান অকুলান। সুতরাং তাঁর শ্রীচরণ আমার উন্মুক্ত বক্ষেই স্পর্শ করে আছে। যেতে যেতে অনেক বিষয় উঠল, ঠাকুর একটা কথা প্রসঙ্গে বললেন—এর কাছে ফুলের মালাও যা, জুতোর মালাও তাই। নিন্দা প্রশংসা দুইই সমান এ'র কাছে। কথা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর কথা উঠল তাঁর ছেলেবেলাকার দোষত্রুটির অকপট স্বীকারোক্তি ইত্যাদি নিয়ে। ঠাকুরের কথার মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হল।

একসময় আমরা এসে পড়লাম শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে। ঠাকুরের সঙ্গীসেবক এসেছেন দু-একজন, ঠাকুর আমাদের সকলকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন সোনামণিদার বেডের পাশে। সোনামণিদা তো ভাবতেই পারেন নি ঠাকুর কৃপা করে তাঁর এই বেয়াড়া ছেলেটিকে দেখতে আসবেন। তিনি বসেছিলেন বিছানায়। ঠাকুরকে দেখে তিনি যুক্তহস্ত, দরবিগলিত, রুদ্ধকণ্ঠ। ঠাকুর মাথায় হাত দিলেন, বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে? সোনামণিদা বায়ুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন কোনওরকমে তাঁর রোগের কথা। ঠাকুর সোনামণিদার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করার পর ঠাকুর এবার ওয়ার্ড থেকে প্রস্থানোদ্যত হলেন। কিন্তু বেরুবেন কি করে! ইতিমধ্যেই ঠাকুরের আগমন বার্তা নার্স, আয়া, রোগী সকলের মধ্যেই সাড়া ফেলে দিয়েছে। সকলে এসে ঠাকুরের কাছে ভীড় করেছেন প্রণাম করবেন বলে। ঠাকুরও প্রস্তুত। সুতরাং লাইন করে প্রণাম চলল। এরপর ঠাকুর এগুলেন ওপরতলার ওয়ার্ডের দিকে, কারণ সেখানে ভর্তি আছেন আমার ছোট জ্যাঠামশাই (শ্রীমান অশোকের বাবা)। তাঁর কথাও ডুমুরদহে ঠাকুরকে জানিয়েছিলাম। ঠাকুর এবার তাঁকে কৃপা করতে যাবেন। সেখানেও একই দৃশ্য! ঠাকুর সেখানে পৌঁছুতেই ভীড়। সময়টা ভিসিটিং আওয়ার্স হওয়ায় রোগীদের দেখতে আসা আত্মীয় পরিজনবর্গও ঐ ভীড়কে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। সকলেরই বাসনা ঠাকুরকে একবার প্রণাম করা। ঠাকুর সকলকে আশ্বস্ত করে এগিয়ে এলেন ছোট জ্যাঠামশাইয়ের বেডের পাশে। ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, সস্নেহে তাঁর কণ্ঠলগ্ন মালা পরিয়ে দিলেন ছোট জ্যাঠামশাইয়ের গলায়। তারপর প্রণামপর্ব। ওয়ার্ডের অসমর্থ রোগীদের বেডের কাছে গিয়ে ঠাকুর একে একে তাঁদের মাথায় স্পর্শ করলেন।

এইভাবে দুইজন রোগীকে উপলক্ষ করে সেদিন শ্রীরামপুর হাসপাতালে বহুজন তাঁর কৃপাস্পর্শ পেলেন। ঠাকুর এবার বেরিয়ে পড়লেন ডুমুরদহের পথে। তখন বেলার বুকে পড়েছে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া। তাঁকে ফিরতে হবে সেখানে তাড়াতাড়ি, অপেক্ষায় রয়েছে অসংখ্য ভক্ত আর তাঁর শ্যামসঙ্ঘের ছেলেরা, যাঁদের অভিনয় আয়োজনের প্রাণপুরুষ তিনি।

সমাপ্ত

মহানন্দের সন্ধানে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের প্রেমের রাজ্যে কিছুক্ষণ

সূরথ চট্টরাজ

ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভগবততত্ত্বের সর্বোত্তম পীঠস্থান হল আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। এদেশের প্রতিটি কোনায় লুকিয়ে আছে ঈশ্বরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এবং নিহিত আছে অসংখ্য কৌতূহল। এরকমই এক কৌতূহল পূর্ণ স্থানের অলৌকিক কথা জানার পর সর্বসাধারণকে না জানিয়ে পারা যায়! স্থানটি যে অতি পরিচিত তা নয়, বাঁকুড়াস্থিত একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ব্রজরাজপুর। বেশ শান্ত, নিরিবিলি, এই গ্রামের মধ্যে একটি পুরাতন ও অভূতপূর্ব মন্দির শ্যামসুন্দর জীউয়ের মন্দির। এই ছোট মন্দিরটি ছোট হলেও এর পেছনের ইতিহাস যেমনি বড় ঠিক তেমনই অসংখ্য শ্রদ্ধালু ভক্তদের শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, বিশ্বাস একে আরও বড় বানিয়ে তুলেছে। মন্দিরটি বংশগতভাবে গোস্বামীদের, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগদাধর গোস্বামীর বংশধরগণের।

কথিত আছে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পার্ষদপ্রবর শ্রীগদাধর গোস্বামী নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে কাটোয়ায় এবং পরে কলকাতার প্রায় চার ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত এড়েদহ নামে একটি স্থানে বাস করতেন। শ্রীগদাধর গোস্বামীজী এক অদ্ভুত প্রেমময় পুরুষ শ্রীবাণীকৃষ্ণ গোস্বামীকে সন্তানরূপে পেয়েছিলেন। এই বাণীকৃষ্ণ গোস্বামীর দুই সন্তান—শ্রীঠাকুরানন্দ ও শ্রীমথুরানন্দ। এদের মধ্যে শ্রীমথুরানন্দ গোস্বামী শ্রীধাম বৃন্দাবনে গেছিলেন। অতীতকাল থেকেই এই গোস্বামী বংশের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। যাইহোক, বৃন্দাবনে তিনি শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবারত থাকতেন। তাঁর এই নিষ্কাম ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে শ্যামসুন্দর গৌড়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যদিও কথিত আছে এই শ্যামচাঁদকে (স্থানীয়দের দ্বারা শ্যামসুন্দর এই নামেই সম্বোধিত) গৌড়ে নিয়ে আসা মোটেও সহজ কাজ ছিল না। বৃন্দাবনবাসী শ্রীগঙ্গাধর চৌবে মহাশয় এই ঠাকুর দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, অনেক সাধ্য-সাধনার পর তিনি দিতে রাজী হন, পরিবর্তে চেয়ে বসেন ঠাকুরের সম ওজনের স্বর্ণমুদ্রা, যা সেইসময়ে এক সাধারণ লোকের দুঃসাধ্য ব্যাপার। শোনা যায়, অনেক কষ্টে মথুরানন্দজী মাত্র পঁচিশটি স্বর্ণমুদ্রা জোগাড় করেন ও নিরুপায় হয়ে তাই দেন গঙ্গাধর চৌবে মহাশয়কে। আশ্চর্যের বিষয় কষ্টিপাথর ও নিরেট অষ্টধাতুর বিগ্রহ সেইসময় অলৌকিকভাবেই ঐ পঁচিশটি স্বর্ণমুদ্রার ওজনের সমান হয়ে যায়। গঙ্গাধরজী প্রভুর ইচ্ছা বুঝতে পেরে ঠাকুরকে মথুরানন্দের কাছে সমর্পণ করেন। গৌড়ে এসে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করার পর এই অখ্যাত গ্রাম ব্রজরাজপুর শ্যামসুন্দরের সেবা প্রকাশের বিশেষ অনুকূল হওয়ায় এবং ধলভূমাধিপতি পরম সৌভাগ্যবান রাজা বাহাদুরের সেবা-প্রাণতায় আকৃষ্ট হয়ে সেবাকার্যের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের সুব্যবস্থা করায় তিনি এই স্থানেই শ্রীশ্যামসুন্দর জীউকে চির প্রতিষ্ঠিত করেন। শোনা যায়

এই চরম নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের সেবাকার্য করার ফলেই অপুত্রক রাজার পুত্রলাভ হয়েছিল। রাজা বাহাদুর নিত্যসেবার জন্য তার রাজত্বের একআনা অংশ দান করেন। শ্রীমথুরানন্দের সুযোগ্য পুত্র শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামীর চেষ্টায় শ্রীধাম ব্রজরাজপুরে মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং প্রায় একইসময়ে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীশ্রীরাসযাত্রার শ্রীমন্দির ও শ্রীশ্রীদোলযাত্রার শ্রীমন্দির নির্মিত হয়েছিল। তার ইচ্ছায় শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীবৃন্দাবনীয় সেবার সম্প্রসারণ ঘটে। তাঁর বংশধরগণ এই ব্রজরাজপুরেই বাস করেন এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন। এহেন ঐতিহ্যপূর্ণ পরিবারের অংশ হলে কার না গর্ববোধ হয়! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তগণের অন্যান্য শাখার মধ্যে গদাধর দাস শাখা অন্যতম। শ্রীমহাপ্রভুর নিজ শাখা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন ঃ

শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্বোপরি।
কাজিগণের মুখে যিঁহো বোলাইলা হরি।।
চৈঃ চঃ অঃ ১০।৫৩

শ্রীমথুরানন্দ গোস্বামীর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত নির্দিষ্ট সেবা অনুসারে শাখার প্রত্যেক পল্লব শ্রীধামে নিত্য সমাগত হয়ে প্রতিদিন শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা করে মহাপ্রসাদ বিতরণ করে এখনো জনমানসের অশেষ কল্যাণ সাধন করে চলেছেন। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউয়ের মন্দিরটি ছোট ও অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত। মন্দিরটিতে শূদ্রজাতির প্রবেশ নিষেধ ছিল। বর্তমানে কেবলমাত্র মূলগর্ভগৃহে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রবেশ নিষেধ। মন্দিরের বামপার্শে ঠাকুরের রন্ধনশালা। প্রত্যহ চারবার ঠাকুরের ভোগ হয় যার বার্ষিক খরচ কমপক্ষে সাত লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা এবং এর সবটুকুই ঠাকুরের নিজস্ব সম্পত্তির থেকেই আসে। অর্থাৎ ঠাকুরের বিশাল সম্পত্তি সমস্ত গোস্বামী বংশধরদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা নিত্যসেবার অর্থ ঐ জমি থেকেই উপার্জন করতে পারেন। নিত্যসেবায় অনিবার্যভাবে লাগে মুড়কি, চিঁড়ে, লাড্ডু, পরমান্ন এবং কুমড়োর একটি পদ, এই কুমড়ো নিয়ে জনমানসে প্রচলিত একটি অলৌকিক কথা হল এই কুমড়োর জন্য শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ নাকি একবার ভিন্‌গ্রামের একজনের কুমড়ো ক্ষেতে কুমড়ো চুরি করতে গিয়ে নিজের শ্রীচরণের নুপুর ফেলে এসেছিলেন এবং পরে স্বপ্নাদেশ পেয়ে আজও বংশ পরম্পরায় ঐ ভক্ত নিত্যসেবার কুমড়ো সরবরাহ করে চলেছেন। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের নিত্যসেবার সাথে এখানে হয় নিত্য অন্নছত্র। যার জন্য পৃথক রন্ধনশালা, উপযুক্ত স্থান ও সেবকবৃন্দ আছেন। অন্যান্য সব কিছুর মতো এখানের শ্রীবিগ্রহও কম বিস্ময়কর নয়। বৃন্দাবন থেকে এসেছিলেন শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ এবং শ্রীমতী রাধারাণীর যুগলমূর্তি, কিন্তু এখানে এলে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের ও রাধারাণী ছাড়াও অন্য একটি নারীমূর্তি, কথিত আছে এই নারীমূর্তি যা আজ পরমপূজনীয়া সেটি এই গ্রামেই একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা ললিতার মূর্তি। শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাই না! এই ছোট মেয়েটি শ্রীশ্যামের নিত্য পুরোহিতের কন্যা ছিলেন, নিত্যসেবায় সাহায্য করা ছাড়াও মন্দিরেই সবসময় তিনি থাকতেন, খেলতেন, তদানীন্তন ভারতবর্ষে মেয়েদের অবস্থা অতি করুণ হওয়ার দরুণ তাঁর একাকী মন্দিরে থাকার ব্যাপারটি কেউ ভালভাবে নিত না। এজন্য প্রত্যহ তাঁকে অনেক লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হত। কিন্তু ভগবৎপ্রেম হয় দুর্নিবার, এ সবের মধ্যে তাঁকে স্বয়ং শ্রীশ্যামসুন্দর জীউ একদিন একটি লাড্ডু খেতে দেন এবং এ বিষয়ে কাউকে না জানানোর কথা বলেন, ভুলবশতঃ ললিতা এটি তার পরিবারে জানালে ললিতা একরাত্রের মধ্যে দেহত্যাগ করেন এবং সেই রাত্রেই শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের আদেশ হয় তাঁর দেহ দাহ না করে সমাধিস্থ করার এবং সমাধির স্থানে একটি নিমগাছের সৃষ্টি হয়, সেই কাঠ দিয়ে ললিতার প্রতিকৃতি বানানোর পর তা শ্রীশ্যামসুন্দরের ডানপাশে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় এরপর থেকেই প্রতি রাত্রে শয়নের পর মন্দিরের দ্বার বন্ধ হওয়ার পর শ্রীমন্দিরে কিছু অলৌকিক কার্যকলাপ শুরু হয়, রোজ ভোরে দেখা যায় ঠাকুরের সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন বালিশ, চাদর, বাঁশী, মুকুট, মালা, নুপুর যেখানে সেখানে পড়ে থাকে অগোছালোভাবে, সবাই বলেন ললিতার

আগমন রাধারাণী মেনে নিতে পারেননি তাই শ্রীশ্যামসুন্দরের সাথে নিত্য কলহ করে সামগ্রী ছুঁড়ে দেন। তিনি যে শ্যামের একমাত্র প্রিয়তমা, অন্যর উপস্থিতি মেনে নেবেন কেন? কিছুটা সাধারণ জীবনযাত্রার মতোই। মন্দিরের সম্মুখে হরিবাসরের স্থান ও একটি পুরাতন কদমবৃক্ষ। কথিত আছে এই বৃক্ষটি মন্দির স্থাপনেরও আগেকার কিন্তু এখনো যেন পূর্ণ যুবক। এই মন্দিরটিতে কার্তিক মাসের ২০ তারিখ থেকে ১০ দিন মঙ্গল আরতি হয়। ঐ ১০দিন এখানে একটি সমবেত বাদ্য বাজান হয়, স্থানীয় লোকেরা যাকে টিকিরা বাদ্য বলেন। এটিতে ঢাক, ঢোল, সানাই, খোল, করতাল মিলিত হয়ে ঠাকুরের মহিমা গান করা হয়। ভারী অপূর্ব সেই সঙ্গীত। এখনও গোস্বামীদের সন্তান হলে এই মন্দিরের পরমান্ন দিয়েই তাদের অন্নপ্রাশন করা হয়। এই মন্দিরের প্রধান উৎসব মধ্যম রাস ও মধ্যম দোল, প্রচুর ভক্তের সমাগম ঘটে এই দুই উৎসবে, তিল ধারণেরও স্থান থাকে না। কিন্তু এই রাসে এবং দোলেই একমাত্র শ্রীবিগ্রহকে স্পর্শ করার সৌভাগ্য জোটে। যেন সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করে ঠাকুর ধরা দেন ভক্তদের ভক্তির টানে। এইসময় শ্রীবিগ্রহকে নিজস্ব পালকিতে করে মন্দিরের বাইরে দোলমন্দির এবং রাসমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছুক্ষণ আমোদ-প্রমোদের পর আনন্দধারা বর্ষণ করিয়ে ঠাকুর ফিরে আসেন মূল মন্দিরে। এই মূল মন্দিরে এসে গর্ভগৃহে ঢোকার পূর্বে সমস্ত সেবকবৃন্দ, পুরোহিত ও গোস্বামীগণ নিষ্ঠাপালনপূর্বক ঠাকুরকে কোলে নিয়ে একটি নৃত্য পরিবেশন করেন, অত ভারী বিগ্রহ কোলে নিয়ে সাবলীলভাবে নৃত্যের কী সুন্দর মনোরম দৃশ্য, একবার দেখলেই বারবার দেখার বাসনা জাগে। যেন শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ, শ্রীমতী রাধারাণী ও সখী ললিতাকে নিয়ে স্বয়ং নৃত্য পরিবেশন করেন। বড় সুন্দর ও আনন্দদায়ক সেই দৃশ্য ক্ষণিকের জন্য হলেও নিজেরই অজ্ঞানতায় কখন যে নিজের পাও সুরে সুর মেলায় বোঝাই যায় না। বড় আকর্ষণ এই স্থানের, প্রতিনিয়ত নানা অলৌকিক ঘটনা আজও ঘটে চলেছে। কখনো নুপূর ধ্বনি, বাঁশির ধ্বনি, পদধ্বনি, কখনো এক অলৌকিক সুগন্ধ ভেসে বেড়ায় বাতাসে, কখনো কখনো সৌভাগ্য হলে সাক্ষাৎও জুটতে পারে কোনো অলৌকিক ঘটনার, প্রকৃতই শ্রীশ্যাম খুবই চঞ্চল, কিন্তু ভক্তের ভালোবাসার বাঁধনে তিনি থাকতে খুব ভালোবাসেন। এসব জেনে ও উপলব্ধি করে সত্যিই খুব আনন্দ হয় ও গর্ব অনুভব হয় এটা ভেবে যে, এই সুন্দর একটি ভগবৎলীলার এবং এই বংশের অন্তর্গত হওয়ার সৌভাগ্য সীতারাম দিয়েছেন। এজন্য নিত্য অসংখ্য ধন্যবাদ—সীতারাম।

জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জয়
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ
রূপ সনাতন।। ১
জয় রূপ সনাতন মেরা, প্রাণ সনাতন।
হরে, কৃপা কর রূপ সনাতন
দয়া করি দেহ মোরে
যুগল-চরণ।। ২

—শ্রীমথুরানন্দ গোস্বামীকৃত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউয়ের সান্ধ্য-ভজন-গীতাষ্টক।

জয়গুরু

সূত্র ঃ 'শ্রীশ্রীমদ্দাস-গদাধর—শাখা পরিচয়।
লেখক ঃ শ্রীকমলাপদ গোস্বামী।
স্থানীয় সূত্র ঃ শ্রীমান চণ্ডীদাস গোস্বামী (মন্দিরের সেক্রেটারী)।
শ্রীমান আশিষ কুমার চ্যাটার্জী (মন্দিরের কোষাধ্যক্ষ)।
শ্রীগৌরাঙ্গ গোস্বামী (গোস্বামী বংশধর ও আমার পরমপূজ্য মাতামহ)
এবং অন্যান্য গোস্বামী বংশধরগণ।

নবজন্ম

দেবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১৯৭৮-এর প্রায় শেষেরদিকে আমার স্ত্রী শ্রীমতী সাধনা চট্টোপাধ্যায়ের ইচ্ছানুসারে আমরা জগন্নাথ দর্শনে যাব, প্রবল ইচ্ছে কিন্তু অর্থের অভাব। দুজনের যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়া সবই আছে। আজ খুব সামান্য হলেও একটু বুঝতে পারি, আত্মাটি যার দেহটি যার, প্রাণটিও তার, সেই প্রাণেতে যদি তিনি ইচ্ছা এনে দেন তো কারো কিছু করার নেই।

ভবতি ভিক্ষাং দেহি—বেড়িয়ে পড়লাম, সর্বময় আনন্দ, দুঃখকষ্ট নিয়েই পৌঁছে গেলাম জগন্নাথদেবের দ্বার প্রান্তে, দর্শনে এত আনন্দ পেলাম, মনে হল যাহা দেখিলাম তাহা জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিবার নয়, তখন বুঝতে পারিনি এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ, আশ্রমস্থলে পৌঁছতেই কানের পাশ দিয়ে ভ্রমর গুণগুণ করে যার বার্তা শুনিয়ে গেল তিনি কিন্তু মাটি পাথর বা কাঠের নয়। তিনি আমার পরম আরাধ্য দেবতা নররূপী নারায়ণ সেখানে স্বয়ং বিরাজিত। আনন্দে চোখ জলে ভরে গেল। মুহূর্ত অপেক্ষা না করেই পৌঁছে গেলাম চক্রতীর্থে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাকে সামনে দেখলাম তাকে মনে মনে বলতে লাগলাম সত্যই এই আত্মা এই দেহ এই প্রাণ সবই তোমার। ইশারায় ভেতরে আসতে নির্দেশ করলেন, বস্ত্র পরিবর্তন করে আমি ও আমার স্ত্রী দুজনে বাবার দুপাশে বসলাম। কথা বলার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেললাম। বুঝলাম আমার পরম দেবতাটি মৌনাবস্থায় রয়েছেন। প্রথমেই হাত থেকে ঘড়িটা খুলে দিতে বললেন, তারপর বললেন সীতারামের কাছে এসেছিস ঘড়ি পরে—যা ঘড়ি আর পাবি না। বলেই কোলের মধ্যে ঘড়িটা লুকিয়ে রাখলেন। বুঝলাম আমার লীলাময়ের লীলা চলছে, অনেক প্রশ্ন উত্তর বাবার সঙ্গে হল, সবই লিখে প্রসাদ গ্রহণ করে, আশীর্বাদ এবং বুকভরা অব্যক্ত আনন্দ নিয়ে ফিরে এলাম।

শ্রীহস্তের স্বর্ণাক্ষরগুলোর ওপর হাত বোলাতে বোলাতে ৭৮ সালের কথাগুলো মনে পড়ে চোখ জলে ভরে এল। ছোটবেলায় আমার দিদিমাকে দেখতাম একটি ছবিতে প্রণাম করতে, যেটা আমাদের ঘরের উত্তরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল, ছবিটাতে রামকৃষ্ণদেব, সারদামা এঁদের মাঝে মা কালি দাঁড়িয়ে আছেন, ছবিটাকে মাঝে মাঝে দেখতাম খুব মন দিয়ে, ছবিটার মধ্যে গাছপালা ছিল, পরে জেনেছিলাম ওটা পঞ্চবটী, গাছপালার প্রতি ছোট থেকেই একটা আকর্ষণ যেমন ছিল তেমনি ওই পঞ্চবটীরও একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম কিন্তু উপায় নেই, নেহাতই ছোট, তখন কে আমাকে ওই পঞ্চবটী দেখাতে নিয়ে যাবে, দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী দেখতে যাওয়া ভাবতেই পারতাম না, প্রায়ই ছবিতে রামকৃষ্ণদেব সারদামা, মা ভবতারিণী আর পঞ্চবটী দেখতাম, ছোটবেলার ওই অনুভূতিকে কেইবা গুরুত্ব দেবে। এই ভাবেই মনটা যেন রামকৃষ্ণদেব-সারদামায়ের প্রতি একাত্ম হয়ে গিয়েছিল মনের ভেতরে ঠিক কি ধরনের অনুভূতি আসতো বলতে পারবো না তবে এটা ঠিক একটা কিছু ভেবে ঈশ্বর জ্ঞানে প্রণাম করতাম, তখন আমার ন বছর বয়স, ক্লাস ফোরে পড়ি, ১৯৫৮ সাল। বেশ কিছুদিন রক্ত আমাশয় ভুগছি, তার প্রকোপ এতই বাড়তে লাগল, দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না, শরীর ক্রমশ দুর্বলতম হতে লাগল, ডাক্তারের ওষুধে কোন কাজ হচ্ছে না, ডাক্তার জবাব দিয়ে দিলেন, বাড়ীর সবাই খুবই চিন্তিত এবং ভীত হয়ে পড়েছেন, একরকম মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া চলছে, এরকম সময় হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় আমার দিদিমা এবং আমার সেজমামা আমায় নিয়ে হুগলি জেলার মগরার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, যেখানে নিয়ে গেলেন

সেখানে খুব ভীড়, মনে হল কোন উৎসব হচ্ছে, বহু মানুষ একত্রে হরিনাম করছেন, খিচুড়ীর গন্ধে চারদিক ভরে গেছে, কিন্তু খিদে পেল না, দিদিমা সকালে বলেছিলেন উপোস করে থাকতে হবে, পারবি তো? বুঝতেই পারিনি কেন উপোস, কিসের জন্য উপোস, ঠাকুরকে প্রণাম করে খেতে পাবে। অথচ কে ঠাকুর, তাকে কেমন দেখতে, আর কেনই বা তাঁকে প্রণাম করবো, আমি তো দিদিমার মত রোজই রামকৃষ্ণদেবের ছবিতে প্রণাম করি। একটি মাটির পাঁচিল দেওয়া স্থান, মাঝে বিছুলির ছাওয়া একটি মাটির ঘর, সেটাই আশ্রম, পাঁচিলের ভেতরে যাওয়ার একটি মাত্র দরজা, সেখানে প্রচণ্ড ভীড়, ভেতরে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেও কোন লাভ হল না, দিদিমা মামা আমায় নিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, যার দরজা আগলে রয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই জটাধারী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, খালি গায়ে খালি পায়ে পরণে ধুতি।

অল্পসময় পরে যেন কার আদেশে একজন এসে বললেন শ্যামনগর থেকে ঠাকুরের খোঁড়া ছেলে কে এসেছেন, ঠাকুর ডাকছেন। ওনারা আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না, মাটির ঘরটির সামনে একজন জটাধারী পা ছড়িয়ে বসে আছেন, দিদিমা আমাকে ওনার পায়ের কাছে শুইয়ে দিলেন, সব শুনে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, বললেন ডাক্তার দেখাগে যা, আমি কি করবো, আমার মামাও একটু জোরের সঙ্গেই বললেন, আপনার চেয়ে বড় ডাক্তার তো কেউ নেই, যা করবার আপনাকেই করতে হবে। তারপরেই একজন আমাকে ধুতি পরিয়ে একটি কম্বলের আসনে বহু মানুষের সাথে বসিয়ে দিলেন, একজন এসে হাতে গঙ্গাজল দিয়ে, মাথায় জল ছিটিয়ে দিলেন এবং গুরু গুরু জপ দেখিয়ে দিয়ে করতে বললেন। আমি চোখ বন্ধ করে গুরু গুরু জপ করতে লাগলাম, কতক্ষণ করেছি জানিনা, হঠাৎ মাথায় একটি হাতের ছোঁয়ায় চমকে উঠলাম। তাকিয়ে যাকে দেখলাম সে দৃশ্য বর্ণনার অতীত, লম্বা জটাধারী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বুকে গুরু পাদুকা, যিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তার মুখে কি মিষ্টি হাসি, আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি খুঁজে পেলাম না।

কি স্নেহময় কি প্রেমময় সে হাসি, তারপরই তিনি তার ডান পা আমার বুকে ঠেকালেন, ঠেকান মাত্র আমার সেই অনুভূতি যেন সব কিছু একাকার হয়ে গেল, মনে হল তিনি যেন সম্পূর্ণরূপে আমাকে আত্মসাৎ করেছেন আর আমি নির্বাক নিস্পলকভাবে তাকেই দেখছি, সেদিন যত আনন্দ পেয়েছিলাম ততো চোখে জল এসেছিল, যা আগে কোনদিন হয়নি। প্রণাম করতেই ভুলে গিয়েছিলাম, কে যেন বললেন প্রণাম করে নাও—প্রণাম করলাম। আবার বললেন প্রসাদ নাও। দিদিমা এবং মামা আমাকে বাইরে এনে জামা-প্যান্ট পরিয়ে দিলেন, আমরা পেট ভরে প্রসাদ খেলাম সেদিনই সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এলাম। সেই আমার নবজন্ম!

লেখকদের প্রতি আবেদন

'পথের আলো'র লেখক-লেখিকাগণকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁরা (সবাই নয়) প্রকৃত লেখা পাঠাচ্ছেন না। জেরক্স কপি পাঠাচ্ছেন। এরজন্য পত্রিকাতে ছাপাতে অসুবিধা হচ্ছে। আপনারা দয়া করে আপনাদের প্রকৃত লেখা পাঠাবেন এবং পরিষ্কার হরফে পাঠাবেন।

সংঘ সমাচার

একটি বিরল মহাপ্রয়াণ মহোৎসব

কিঙ্কর দেবনাথ

মহামিলন মঠে চলছে চাতুর্মাস্যব্রত উৎসব। পরিচালনায় ওঙ্কারনাথ মিশন। সহযোগী ভূমিকায় রয়েছে যুবক সংঘ ও সতী সংঘ। প্রতিদিনই শ্রীনাম প্রবাহে স্নাত হতে আসছেন ওঙ্কারনাথ মিশন ও সতী সংঘের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের গুরুভ্রাতা ও ভগ্নীগণ। আসছেন পার্কের নামকারী ও বিদ্যৎ সংঘের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ।

শ্রীনামপ্রেমী অপরাপর সম্প্রদায় থেকেও ভক্তমণ্ডলী আসছেন শ্রীনাম মঞ্চ উজ্জ্বল করতে। শ্রীনামের সাথে প্রতিদিনই চলছে অন্নছত্র।

এরই মধ্যে বিভিন্ন ভক্ত ও সম্প্রদায় সংস্থার আহ্বানে শ্রীনাম প্রচার চলছে দুর্বার গতিতে।

সম্প্রতি ঝুলন পূর্ণিমার পুণ্য সন্ধ্যায় (১০ই আগষ্ট, রবিবার) কোলকাতা নূতন বাজারের পিছনদিকে শ্রীশ্রীসত্যানন্দ সাধন আশ্রমে, হরিনাম তলায় মিশনের ও যুবক সংঘের ভাইবোনেরা বিশেষ আহুত হয়ে শ্রীনামে অংশগ্রহণ করেন। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমৎ ১০০৮ স্বামী সত্যানন্দ তীর্থ মহারাজ, বাংলা ১৩৪৬ সালের মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে।

ওঙ্কারনাথ মিশনের (পশ্চিমবঙ্গ) কার্য্যকরী সভাপতি তথা পূজ্যপাদ বিঠ্ঠলদেবের বিশেষ বিশেষণে ভূষিত 'নামনায়ক' শ্রীনয়ন ভাইয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে শ্রীনাম প্রচার অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে সার্থক ও আনন্দময় হয়।

জানা যায় এই হরিনামতলায় দীর্ঘ ৭৫ বৎসর ধরে অখণ্ড শ্রীনাম সংকীর্তন চলছে। শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধারাণী ও গোপীনাথজী নিত্য পূজিত হচ্ছেন। মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ মাত্রই অনুভূত হয় অখণ্ড নামের মহিমা। এক অনাবিল আনন্দে মন, প্রাণ, শান্ত হয়ে যায়।

শ্রুতি আছে আমাদের শ্রীভগবান শ্রীশ্রীঠাকুর ওঙ্কারনাথদেব একাধিকবার এই মন্দিরে পদধূলি দিয়েছেন এবং শ্রীবিগ্রহের সাথে কিছু লীলার কথাও।

আমাদের আরও গর্বের বিষয় এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতিতে এবং কর্মকিঙ্করদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তানেরা রয়েছেন ওতপ্রোতভাবে। যথা- সর্বশ্রী তপন গোস্বামীদা, চিত্তরঞ্জন পাঁজাদা, জিতেনদা এবং আহিরীটোলা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের শ্রী অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীঠাকুরকথা এবং সম্প্রদায় সর্বাধীশ পূজ্যপাদ বিঠ্ঠলদেব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করেন ওঙ্কারনাথ মিশনের সর্বভারতীয় মহাসচিব শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুবক সংঘের সভাপতি সর্বশ্রী অনুপ দাস, সচিব ধ্রুবব্রত চক্রবর্তী, কোষাধীশ সুকুমার মণ্ডল এবং মহামিলন মঠের সহ-মঠাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আন্তর প্রেরণায় বিভিন্ন মঠ আশ্রমে মহা আনন্দের সাথে চলছে চাতুর্মাস্য ব্রত উৎসব। পূজ্যপাদ বিঠ্ঠলদেব ওঙ্কারেশ্বরে তপস্যায় যাবার পূর্বে বর্ধমানের অম্বিকা কালনা শ্রীগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ প্রদানসহ ব্রতের সংকল্পের শুভ সূচনা করে গেলেন। এই ব্রত সুষ্ঠুভাবে সমাপনের প্রেক্ষিতে মঠের সঞ্চালক ভাইদের সাথে নয়নভাইকেও সার্বিকভাবে সহযোগিতার জন্য আদেশ করে গেলেন।

এই আদেশকে শিরোধার্য্য করে নয়নভাই মহামিলন মঠ থেকে আমাদের কয়েকজনকে সাথে করে গত বুধবার অর্থাৎ ১৩ই আগষ্ট সকালে রওনা হলেন শ্রীনাম প্রচারে কালনা শহরের উপকণ্ঠে শ্রীগৌরাঙ্গ মঠে। এই মঠ শ্রীশ্রীঠাকুর স্থাপন করেছিলেন বাংলার ১৩৮৬ সনে। বিরাটাকার এই মঠে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন মহাদেবসহ মাকালী বিগ্রহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত সব মঠ আশ্রমকে রক্ষা করা এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পূজ্যপাদ সর্বাধীশজী সর্বতোভাবে সহযোগিতা এবং সাহায্য করে চলেছেন। এই মঠেও বারে বারে উপস্থিত হয়ে সঞ্চালক আধিকারিকদের অনুপ্রেরণা, আর্থিক সংস্থান এবং সহায়তা প্রদান করেছেন ও করছেন।

ওখানে নিরন্তর মঠসেবায় নিযুক্ত রয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আত্মজা পূজ্যা জানকীমায়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও রয়েছেন আমাদের প্রণম্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও অপরাপর প্রণম্য ভাইয়েদের সাথে শ্রীপ্রভাত রায়। আপ্যায়ন ছিল পরিপূর্ণ। শ্রীনাম শ্রবণ, কীর্তন, প্রসাদ গ্রহণ এবং গুরুভ্রাতা ভগ্নীদের সান্নিধ্যে দিনটা মহা আনন্দে অতিবাহিত হল।

জয়গুরু

উত্তর কলিকাতাস্থ পার্কের শ্রীশ্রীনাম প্রচারের তালিকা

সেপ্টেম্বর ২০১৪

০৭	লালবিহারী পার্ক	বিকাল ৪টা
১৪	মহামিলন মঠ (মিলন সভা)	ঐ
২১	অরবিন্দ সেতু	ঐ
২৮	বেদ বিদ্যালয়	ঐ

অক্টোবর ২০১৪

১-৩	মহামিলন মঠে শারদীয়া দুর্গোৎসব পালন হবে (বুধবার হইতে শুক্রবার)	সকাল থেকে
৫	মহামিলন মঠে বিজয়া সম্মিলনী	বিকাল ৪টা
১২	মহামিলন মঠে মিলন সভা	ঐ
১৯	বাদুড় বাগান	ঐ
২৬	ডুমুরদহ বিজয়া সম্মিলনী	সকাল থেকে

আশীষ

কি ঙ্ক রী ম হু য়া

ধ্যানের মাঝে দেখে তোমায়
চেয়ে রই আপন মনে।
কবে যে তোমার দেখা পাব
ভাবি তাই প্রতি ক্ষণে।।
মাঝে মাঝে মন চলে যায়
দূর আকাশ পানে,
মনে তখন তুমিই যে থাকো
চলি আপন টানে।
মোর জীবন ধন্য আজিকে
করি তোমারই সাধনা।
অমোঘ বাঁধনে বেঁধেছো যে
আর কিছু চাবো না।।
মনের সব ব্যাথা বেদনা
উজাড় করে দিয়ে,
জীবন পথে চলবো আমি
শুধু ভালবাসা নিয়ে।
সেই ভালবাসায় আপন করি
নেব সবারে টানি।
এই আশীষই দিও গো মোরে
মোরে আপন মানি।।

গুরুপূর্ণিমায় প্রণতি

ব ন্ধ ন মু খো পা ধ্যা য়

গুরুপূর্ণিমার পূর্ণ তিথিদিনে পড়ে গেছে সাড়া
তোমার প্রতিটি শিষ্যচিত্তে প্রেমের অশ্রুধারা।
আবেগে তারা শ্রদ্ধাপ্লুত সুপবিত্র মন
জগৎগুরু ওঙ্কারনাথ তোমায় করি গো বন্দন।।
অজ্ঞান তিমির রাজ্যের যবনিকা টানি
জ্বাল প্রভু চির অনির্বাণ জ্ঞানের প্রদীপখানি।
সবার জন্য আজ মুক্ত আছে দ্বার
অফুরান তোমার যে সদা প্রেমের ভাণ্ডার।।

ওঙ্কারলোকে

গত ৪ঠা জুলাই (১৯১৪) নদীয়া কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপাধন্য শ্রীযুক্ত নীলমণি দত্ত ৯০ বছর বয়সে সজ্ঞানে সীতারামলোকে গমন করেছেন। ঠাকুরের নিকট সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করার পর গুরু নির্দেশিত পথে সারাজীবন অতিবাহিত করে আমাদের সকলের নিকট এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৭১ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃষ্ণনগর প্রচারলীলায় তিনি সপরিবারে একান্ত নিষ্ঠাবান সেবক হিসাবে বিশেষ গুরুকৃপা লাভ করেন।

অবশেষে ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই তাঁর পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনি সকলের শোক হরণ করে দয়াল ঠাকুর পরিবারের সকলকে ধর্মপথে চালিত করুন।

বিগত ৪ঠা বৈশাখ ১৪২১ (ইংরাজী ১৮ই এপ্রিল, ২০১৪) শুক্রবার দ্বিপ্রহরে তেঘরিয়া, সোদপুর নিবাসী গুরুগতপ্রাণ যুবক সংঘের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীনঙ্কু চক্রবর্তী সীতারাম নাম জপতে জপতে এই পৃথিবীর সমস্ত জড় মায়াবন্ধন কাটিয়ে সুর ও আলোর দেশ ওঙ্কারলোকে যাত্রা করেছেন। তিনি স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা ও প্রিয় দাদুভাইকে রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বৎসর।

তিনি ১৯৯৩ সালের গুরুপূর্ণিমায় শ্রীমদ্ বিঠ্ঠলদেবের কৃপালাভ করেন। অচিরেই শ্রদ্ধেয় পরাশরজীর প্রিয়পাত্র হয়ে যুবক সংঘের সেবাকার্যে দায়িত্ব জীবনের শেষ পর্যন্ত পালন করেছেন। গঙ্গাসাগরের যাত্রীসেবায় তাঁর সেবাকার্য যুবক সংঘ আজও ভুলতে পারে না। যুবক সংঘের সদস্যবৃন্দ তাঁর বিদেহী আত্মার সদ্‌গতি প্রার্থনা করে।

— পথের আলোর গ্রাহকবৃন্দের প্রতি আবেদন —

দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে অনেকেই বেশ কিছু বৎসরের বাৎসরিক উপায়ন এখনও জমা দেননি। তাঁদের প্রতি বিশেষ আবেদন সত্বর বাৎসরিক উপায়ন পাঠিয়ে ঠাকুরের সেবায় ব্রতী হোন। মানি অর্ডার-এ উপায়ন পাঠাবার সময় 'পথের আলো' কথাটি এবং গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করুন। প্রতিটি যোগাযোগের ক্ষেত্রে দয়া করে পিনকোড নং এবং টেলিফোন নং ব্যবহার করুন।

জয়গুরু

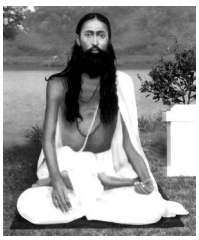

পরমগুরুদেব ঁদাশরথিদেব যোগেশ্বরের আশীর্বাণী

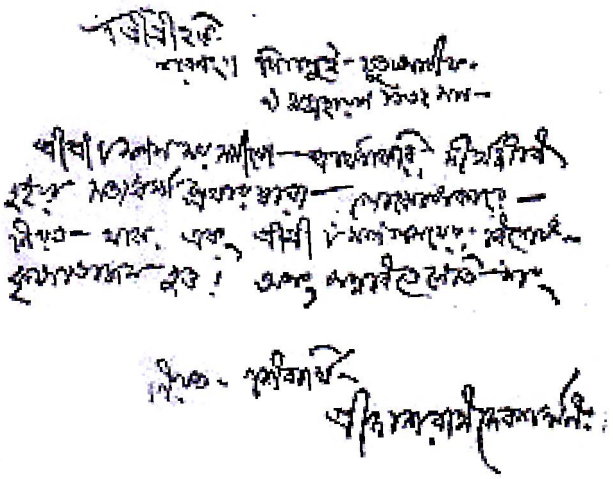

জয়গুরু

মাসিক মিলন পত্র

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

শ্রাবণ, ১৪২১ চতুর্থ সংখ্যা

সূচী ঃ

● **সঙ্গের ছিন্ন স্মৃতি** □ প্রসাদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৪০
● **শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচার পরিক্রমা** □ হরিসাধন ভট্টাচার্য্য ১৪৪

সঙ্গের ছিন্ন স্মৃতি

প্র সা দ চ ন্দ্র মু খো পা ধ্যা য়

১০ই ভাদ্র, ৬৬—আজ উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। বাবার দৈনন্দিন কর্ম্মসূচীগুলি যথাযথ সময়ে পালিত হল মাত্র।

১১ই ভাদ্র, ৬৬—আজ বাংলা হতে কয়েকজন ভাইবোন এলেন। এ ছাড়া পূর্ব্ববৎ।

১২ই ভাদ্র, ৬৬---আজ প্রাতে সুধীরদা কলিকাতা হতে সস্ত্রীক এলেন। আজ ২টার সময় বাবা ঁপুরীধাম হ'তে ফিরলেন। এসেই প্রথমে ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরে পরে আশ্রমে পণ্ডিত শ্রীমৎ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের দর্শনে গেলেন। পারস্পরিক সংযোগ হওয়া মাত্র উভয়ে উভয়কে জড়িয়ে ধরে গভীরভাবে অনেকক্ষণ অবধি আলিঙ্গনাবদ্ধ রইলেন। সে বড় মধুর এবং উপভোগযোগ্য দৃশ্য। যেন হৃদয় বিনিময়। অতঃপর নৌকাযোগে আসিয়া অন্নভোগ নিবেদন করলেন। বিশ্রাম না নিয়েই বাবা এই আটদিনের ঝটিতি ভ্রমণ বৃত্তান্ত বললেন। এক্ষেত্রে নাগপুরই বাবাকে যাতায়াত উভয় পথেই বেশীক্ষণ ধরে পাবার সৌভাগ্য পেল। নাগপুর ও বহরমপুর উভয় স্থানেই ২।১০ জনকে উদ্ধার করলেন।

বাবাকে পিসিমা বিশ্রাম করতে ডাকলে বাবা উঠে গেলেন বটে; কিন্তু পরক্ষণেই আশ্রমে চলে গেলেন পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আলোচনা করতে। রাত্রি ৯টায় আশ্রম হতে ফিরলেন। এরপর প্রার্থনাদি করে যথারীতি কার্য্যসূচী প্রতিপালন করলেন। বিশ্রাম বলে তিনি কিছু জানেন না; যেন এখন সর্বদাই কর্ম্ম প্রবণ। আলস্য নাই বল্লেই চলে। গোবিন্দ চৌধুরী দাদা রাজস্ব মন্ত্রী প্রভৃতিকে নাম মণ্ডপ রক্ষার কথা বলছেন নামমণ্ডপ লীজ নেবার বন্দোবস্ত হয়েছে বাবা একখানি পত্র রাজস্ব মন্ত্রীকে ও একখানি পত্র প্রধানমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাবকে দিয়ে এসেছেন কীর্ত্তন মণ্ডপ রক্ষার জন্য।

বিমলদা বহরমপুরে থাকবার প্রার্থনা করায় বাবা তাঁকে সেখানে রেখে এসেছেন।

১৩ই ভাদ্র, ৬৬—আজ প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি করে বাবা প্রথমে আশ্রমে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। আশ্রমে যাওয়া এখন দুর্গম। কারণ নর্মদার জল বেড়ে রাস্তা ডুবে গেছে। পাহাড়ের উপর উঠে আশ্রমে যেতে হয়। আমরা অনেক পেছিয়ে এলাম। বাবা কিন্তু ঠিক চললেন। এরপর বাবা মন্দির হতে এসে প্রার্থনা করলেন। তিনি প্রথমে বললেন তারপর আমরা সকলে সমস্বরে বললাম।

প্রার্থনার পূর্ব্বে ও প্রণামের সময় বাবা ত্যাগী ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন 'যখন কৌপীন নিয়েছিস্ তখন ভোগের আশা কেন?' তাঁর বস্‌বার চেয়ারে একখানি লোমের র‍্যাগ পাতা ছিল। সে খানিকে তিনি তখনই তুলতে বলে একখানি মোটা কম্বল পাতালেন। 'কেন কোমল জিনিস স্পর্শ করবে? ছেলেরা সূক্ষ্ম কাপড় পরাবার জন্য আনে ভিতরে বাসনা আছে এর দ্বারা বোঝা যায়। এ ভোগাশার একবারে নষ্ট করতে হবে।'

আজ অপরাহ্নে পণ্ডিত মশাই বাংলায় ফিরে গেলেন। বাবা ও তাঁর কয়েকজন সন্তান নর্মদার

অপর পারে বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দিয়ে এলেন, তখন সন্ধ্যা ৭টা। এরপর যথারীতি প্রার্থনাদি করালেন।

১৪ই ভাদ্র, ৬৬—আজ বাবা মন্দির থেকে ফিরে নর্মদায় জল আনতে গিয়ে অবগাহন স্নান করলেন। স্নান করে উঠে নর্মদাকে প্রণাম করে বললেন ২৮শে মাঘ নর্মদায় স্নান করেছিলাম আর আজ ১৪ই ভাদ্র স্নান করলাম। পরে বাবা কয়েকটি ভাইবোনকে উদ্ধার করলেন।

আজকাল বাবা সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় নিজে প্রার্থনা বলিয়ে দেন—তাঁর ছেলেদের একবার ও মেয়েদের একবার। মোটের উপর বাবা দিনে ৬বার প্রার্থনা করেন।

অবশিষ্ট দিন বাবা যথারীতি কার্য্যসূচী পালন করলেন।

১৫ই ভাদ্র, ৬৬—আজ হোসেঙ্গাবাদ থেকে কয়েকজন ভাইবোন এসেছেন। তাঁদের অনেকে দীক্ষা নিয়ে অন্নপ্রসাদ নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। যাবার সময় বাবাকে হোসেঙ্গাবাদ যাবার জন্য প্রার্থনা জানালেন।

আজ পাঁচুদা সপরিবারে বাড়ী ফিরলেন। আমাদের বিদ্যাপীঠের গোপাল ভাইও বাংলায় ফিরে গেলেন। বিদায় নেবার সময় বাবা স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ তাকে একটি পেন উপহার দিলেন।

বাবা আজ রমেনদার ৯ই ভাদ্র, ৬৬-র ঁপুরীধামের পশ্চিম দরজার নামমণ্ডপ রক্ষা সংক্রান্ত পত্র পেলেন। উহার বিবৃত অংশ—'আপনার নির্দেশ অনুযায়ী সঙ্গে দেখা করিয়া বিস্তারিত বলিলাম, এবং সঙ্গের পত্রখানিও অর্থাৎ দুইখানি পত্রই দেখাইলাম। সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া...।' ...সঙ্গে কতরকম খেলা করেন। কাহারও চুলের বেণী ধরে টানেন। কাহারও মাথার টুপি নিয়ে পরেন এইরকম কত খেলা যে তার ইয়ত্তা নাই।

আজ নর্মদার জল অনেক কমে গেছে। নৌকা অনেক দূরে গিয়ে পাড়ি দিচ্ছে। আজ ডাক এসেছে বেলা ৭টার জায়গায় ১২টার সময়।

আজ ইন্দোর থেকে কয়েকটি ভদ্রলোক ও মহিলা বাবাকে দর্শন করতে এলেন।

১৯শে ভাদ্র, ৬৬—আজ শ্যামনগর থেকে এক গুরুভাই সপরিবারে এলেন। ইনি গত মঙ্গলবার শ্যামনগর থেকে যাত্রা করেছেন। বৃষ্টির দরুণ কলকাতার বাস ট্রাম বন্ধ থাকায় তিনি ওয়েলিংডন ব্রীজ দিয়ে বালী হয়ে হাওড়ায় বম্বে মেল ধরেছেন। এখানে এসে দুদিন ধরে নর্মদা পার হতে পারেন নি। নর্মদার অত্যধিক জল বাড়ায় খেয়া বন্ধ ছিল।

আজ মেমারীর কয়েকজন গুরুভাই অপরাহ্নে বিদায় নিলেন।

অবশিষ্ট দিন পূর্ব্ববৎ।

২০শে ভাদ্র, ৬৬—আজ মউ হোতে কর্ণেল লচমন সিং ও মেজর কেহার সিং নামে দুইটি পাঞ্জাবী ভাই ও দুইটি পাঞ্জাবী মহিলা এলেন। শেষোক্ত পাঞ্জাবী ভাইকে বাবা আজ কৃপা করলেন। ইন্দোর ও হোসেনাবাদ হতেও কতিপয় ভদ্রলোক বাবাকে দর্শন করতে এলেন।

বাবা আজ সান্ধ্য প্রার্থনার পূর্বে তাঁর শ্রীহস্ত লিখিত ''অবতার'' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করে শুনালেন, এই সঙ্গে বললেন আজ থেকে প্রত্যহ একটু একটু পাঠ হবে। অবতারের অনেক লক্ষণ। তার মধ্যে একটি লোক-কল্যাণের জন্য ধর্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করা। বাবাকে জগৎ কল্যাণের মূর্ত্ত বিগ্রহ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এবারের চাতুর্মাস্যের বিশেষত্ব বাবা নিজে হাতে সমস্ত পরিচালনা করছেন। এমনকি কে কখন নাম করবে সেটিও নিত্য শ্লেটে লিখে দিচ্ছেন।

সন্ধ্যারতির পর বাবা কীর্ত্তন মণ্ডপে এসে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে মঞ্চে বেড় দিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করলেন। অন্যদিন বাবা ৯টায় নাম মণ্ডপে এসে নাম শুনেন। আজ কিন্তু তিনি ত্রিতন্ত্রী, বীণা, তানপুরা, কাসাই বাজাইয়া রাত্রি ১১টা পর্যন্ত নাম করলেন। আজ যেন আনন্দময়ের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ কিছু বেশী।

২১শে ভাদ্র, ৬৬—আজ প্রাতে শান্তিনিকেতন হতে ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র কলাবিদ্ শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে মহোদয় দাদা আমাদের বাণী মা এবং বর্ধমানের শৈলেন ডাক্তার দাদার স্ত্রী অরুণা মা বাবাকে দর্শন করতে এলেন। ইনি আজই অপরাহ্নে এখান হতে বিলাত রওনা হলেন। আজ বাংলা হতে আরও ২০।৩০জন গুরুভাইবোন এলেন।

আজ থেকে বাবা তাঁর ছেলেদের বললেন দেখ্ দুই বৎসর পূর্বে মৌনকালে সীতারাম ভেবেছিল যে অখণ্ড কীর্তনের সঙ্গে বাহিরে নাম মহিমা কীর্তন করা হবে। একদল নামকারী আর একদল নামকারীকে যখন ছাড়িয়ে দিয়ে তাদের বিশ্রাম দেবে, তখন বাহিরে 'নামমহিমা' গান করে নামসহ প্রবেশ করবে ও মণ্ডপের দেবতাকে প্রদক্ষিণ করে নাম আরম্ভ করবে; আর যে দল বিশ্রাম লাভ করবে তারা বাহিরে এসে কিছু নাম মহিমা গান করে শ্রীগুরুদেবের জয় দিয়ে প্রস্থান করবে। তাই নিজে তার প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিলেন কয়েকদিন ধরে। সে কি আনন্দের রোল, কি নৃত্য, নিজ চোখে না দেখলে ঠিক ঠিক বোঝা যায় না।

আজকাল প্রসাদের পর বেলা ১১।৩০ হইতে প্রায় ১টা পর্যন্ত বাবা তাঁর ছেলেদের নিয়ে তাঁর স্বরচিত কয়েকটি কীর্তন গান উদ্দণ্ড নৃত্য সহিত গাহিতে লাগিলেন। সে কি আনন্দের লহরী!

অন্ন প্রসাদের পর আজ বাবা ক্ষেপার ঝুলি থেকে 'পরমাণু' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করে শোনালেন। পরমাণুর বিস্তৃত বিবরণ সত্বর দেবযানে প্রকাশিত হবে।

স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক অবাধ মিলনে তাহাদের পরস্পরের অণু সংক্রমিত হয়। ইহার প্রতিকার ছেলেরা মেয়েদের চরণে দৃষ্টি রেখে মা মা বলে কথা কইবে। মেয়েদের চরণে সত্ত্ব, মধ্যে রজঃ ও মুখে তম 'অণু' বিরাজ করে। সুতরাং মুখের দিকে দৃষ্টি থাকলে তম 'অণুতে' ছেয়ে ফেলবে।

বাবা তাঁর 'ব্রজনাথ গাথা' থেকেও খানিকটা পাঠ করে শুনালেন, মর্ম্ম জগৎ সংসার জুড়ে একা 'মাই' বিরাজ করেছেন। তিনিই ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্মের নাশ করতে যুগে যুগে আবির্ভূত হন।

অপরাহ্ন ৫টায় বাবা মুকুলদাদাকে পারঘাটায় গিয়ে পার করে দিয়ে এলেন।

২২শে ভাদ্র, ৬৬—আজও কয়েকটি পাঞ্জাবী ভাই সপরিবারে বাবাকে দর্শন করতে এলেন। এদের মধ্যে কর্ণেল ওর্দয়াল সিং তাঁহার পিতা ও পরিবার আজ বহুদিনের ইপ্সিত বাবার কৃপা লাভ করলেন।

আজও মধ্যাহ্ন প্রার্থনার পূর্বে উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্তন হল। পাঞ্জাবী ভায়েরা কীর্তনের সময় চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন বাবা তাদের হাত ধরে টেনে এনে নাচতে ইঙ্গিত করলেন। অফুরন্ত আনন্দ!

আজ অপরাহ্নে বাবা তাঁর ক্ষেপার ঝুলি থেকে 'অবতার' ও 'সাধু হব' পাঠ করলেন। ব্রজনাথ গাথা থেকেও কিছু পাঠ করলেন। পাঠের পর নাম মহিমা গীত ও নৃত্য। ইহার পর প্রার্থনা, মৌন এবং প্রণাম নিয়েই পুনরায় কীর্তন। আজ নাম মণ্ডপ বেড় দিয়ে নৃত্য করতে করতে বাবা ভাব বিভোর। নামমণ্ডপ বদলে তাঁহাকেই বেড় দিয়ে নৃত্য করতে ইঙ্গিত করলেন এবং পরক্ষণেই সমাধিস্থ হলেন।

২৩শে ভাদ্র, ৬৬—আজ বালী থেকে লক্ষ্মীমা ও কলিকাতা থেকে দুর্লভদা সদলবলে এলেন। বাবার ভোগের জন্য কত কি ফল এনেছেন। এঁদের আগিয়ে আনতে বাবা ঘাটে নেমে গেলেন। মা ও সন্তানের দীর্ঘ ৭ মাসের পর মিলন সে এক মধুর দৃশ্য!

আজ কোটা জংশন থেকেও কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন। এঁরা বাবাকে জংশনে নেবার জন্য প্রার্থনা জানালেন।

আজ ৩দিন বাবা প্রার্থনা, নাম মহিমা সংকীর্তন ও অপরাহ্নে পাঠ করলেন। আজ ক্ষেপার ঝুলি থেকে 'নিজের চরকায় তেল দাও' প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনালেন। বিষয়টির কিছু উদ্ধৃত করছি—এক ব্রাহ্মণ তার গুরুকে বললেন 'ঠাকুর আমার বাবাকে একটু কৃপা করুন। উনি কিছুই করেন না।' গুরু বললেন 'তুমি কি কর?' সে বলল 'আমি সারাদিনে ৪ ঘণ্টা জপধ্যান করি।' আর বাবা এক ঘণ্টাও করেন না।' গুরু বললেন 'তুমি কি করে জান্‌লে তোমার বাবা কিছু করেন না! তুমি ক'ঘণ্টা বাবার কাছে থাকো?' শিষ্য বলল 'সমস্ত দিনে আমি বোধহয় ঘণ্টা দুই তাঁর সঙ্গে থাকি।' গুরু বললেন 'তা হলে বাকি ২২ ঘণ্টায় যে তোমার বাবা জপধ্যান করেন না তা তুমি কি করে জান্‌লে? তুমি ৪ ঘণ্টা জপ কর বলে অহঙ্কার করো না। অপরে কে কি করে না করে দেখ্‌তে যেও না। নিজের চরকায় তেল দাও।' আরও স্ত্রী পুরুষের অবাধ সম্মিলন সম্বন্ধে পাঠ করলেন। বললেন পুরুষ ঘৃত কুম্ভ ও স্ত্রী অগ্নিস্বরূপ, কাছে গেলেই গলে যাবে। সামনে হয় না, স্ত্রী দর্শন মাত্রই মন চঞ্চল হয়।'

ব্রজনাথ গাথা থেকেও কিছু পাঠ করলেন। অতঃপর আবার প্রার্থনা মৌন প্রভৃতি চললো।

২৪শে ভাদ্র, ৬৬—আজ বাবা প্রথমে তাঁর শৈশব অবস্থার কিছু পাঠ করে শোনালেন।

ক্ষেপার ঝুলি থেকে 'ঐ গাড়ী এলো' ও 'আসন' নামক দুইটি প্রবন্ধ পড়লেন। স্টেশানে যাত্রীরা যেমন টিকিট করে গাড়ীর অপেক্ষা করে আসবার ঘণ্টা হলেই বোঁচকা বুঁচকী নিয়ে গাড়ীর দিকে চেয়ে থাকে। যেমন গাড়ী আসে অমনি উঠে পড়ে। ক্ষেপাও গাড়ী আসছে বলে চড়বার জন্য পঞ্চ ভূতের খাঁচা রূপ বুঁচকী নিয়ে খাড়া হয়ে আছে।

আসনের মধ্যে কম্বল আসন আর স্থানের মধ্যে আপনার গৃহে যথাক্রমে সাধনার প্রশস্ত আসন ও স্থান।

বাবা ব্রজনাথ গাথা থেকেও কিছু পাঠ করলেন। তারপর যথারীতি নাম মহিমা সংকীর্তন, প্রার্থনা, মৌন ও পুনরায় কীর্তন করালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচার পরিক্রমা

হরিসাধন ভট্টাচার্য্য

(৩)

বাবা নিজে যদি আচরণ না করেন তাহলে আমরা কি আচরণ করব? কখনই না। তাই বাবা আমাদের শিক্ষার জন্য, কল্যাণের জন্য তাঁর সৃষ্ট বর্ণাশ্রম রক্ষার বা প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত শাস্ত্রাচার তাঁকে পালন করতে হয়। তিনি যদি বিধি-নিষেধ না মানেন আমরাও তো তাঁর মত সেই পথানুসরণ করব। তাঁরই শাস্ত্রবিধি তিনি ব্রাহ্মণকে বলেছেন ব্রাহ্মণ! তোমার দেহ সুখের জন্য নয় তপস্যার জন্য জগতের কল্যাণের জন্য তোমার এই কর্ম। ক্ষত্রিয়! তোমার এই কর্ম রাজ্য রক্ষা, প্রজাপালন। বৈশ্য শূদ্র তোমাদের এই এই কর্ম। বিধি-নিষেধ আচার-বিচার যদি না করা হয় তাহলে সত্বাদি শুদ্ধি হবে না। সত্ত্বগুণকে না বাড়ালে ধ্রুবাস্মৃতি লাভ হবে না মনস্থির হবে না। সেজন্য শাস্ত্র-বিধি আছে —আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ। এই আহার শুদ্ধি করতে গেলেও জাত বিচার মানতে হবে। তাই বাবা বলেন—'যার তার হাতে, যেখানে-সেখানে, যখন-তখন যা-তা নোংরা খাবি না।' এই যে বর্ণাশ্রম জাত-বিচার যার তার হাতে না খাওয়ার নিষেধ এ কারুর প্রতি ঘৃণার জন্য নয়। নিজের কল্যাণের জন্য সত্ত্বগুণ লাভের জন্যও মানতে হবে। এক শাস্ত্র মানিনা ভগবান জানিনা, মানিনা। কিন্তু নিজের সুখ সুবিধা মত কতক মানি করলে মানা হয় না। তাই বাবা বলেন—প্রেমের পথে সকলে ভগবানকে লাভ করে, লড়াই-এর পথে নয়। তাছাড়া—বাবা সকলকে দেখেন ভগবানের মূর্তি আমরা পারি? স্বার্থের একটু ক্ষতি হলেই তর্জন গর্জন করি। একটা ফুটো পয়সার জন্য লোকের বুকে ছুরি মারতে উদ্যত হই। সাধনা করে যতদিন না 'বাসুদেবঃ সর্বম্' এই জ্ঞান, বোধ না হয় ততদিন শাস্ত্রাচার মানতে হবে।

যাক্ আমরা ফিরে আসতেই বাবার আদেশ হল পরিধেয় বস্ত্রাদি কেচে ফেলার জন্য। বাবাও নিজে আচরণ করার জন্য তাঁর পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড ত্যাগ করলেন। তারপর দীক্ষার্থীদের প্রণাম নিয়ে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করার পর দর্শনার্থীদের দর্শন দান করেন। সন্ধ্যায় ভাষণ হয়। আজকের ভাষণে বলেন—সাধুসঙ্গ মানুষের প্রথম সাধন। সাধু সঙ্গে অতি সত্বর চিত্তশুদ্ধি হয়। সাধুসঙ্গে ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তিলাভ হয়। পরশমণি লোহাকে সোনা করে কিন্তু পরশমণি করতে পারে না। 'সাধু মহাস্পর্শমণি পরশে যাহারে স্বীয় সমতুল্য তিনি করেন তাহারে। সাধুগণ নরনারীকে কৃতার্থ করার জন্য পবিত্র করার জন্যই মানুষের মধ্যে আসেন। সাধুগণ তীর্থভ্রমণ করেন তীর্থ সকলকে পবিত্র করার জন্য। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পাপীর পাপমুক্ত করে তীর্থাদিও কলুষিত হয় মলিন হয় তাই সাধুগণ তীর্থকে নিষ্কলুষ করার জন্য তীর্থ করতে যান। সেজন্য নরনারী সকলের সাধুসঙ্গ করা কর্তব্য।

মানুষের দ্বিতীয় সাধন স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায়ের অর্থ সগ্রহপাঠ অর্থাৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন। যেমন—শ্রীমদ্ভাগবত রামায়ণ, মহাভারত গীতা চণ্ডী প্রভৃতি। স্বাধ্যায়ের দ্বারা ভগবানে ও শাস্ত্রে বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ় হয়।

মানুষের তৃতীয় সাধন হল শ্রীভগবানের নাম কীর্তন। কেবল মাত্র যদি সর্বথা নামাশ্রয় করা যায় তাহলে সাধুসঙ্গের ও স্বাধ্যায়েরও প্রয়োজন হয় না। নামে রুচি আনার জন্যই শাস্ত্র অধ্যয়ন করা ও সাধুসঙ্গ করা। সাধুগণ ও সর্বশাস্ত্র একবাক্যে বলেছেন কলিতে নাম ভিন্ন অন্য গতি নাই।

এইভাবের অপূর্ব নাম মহিমা ও পুত্রের কর্তব্য, নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে বলেন। তারপর বল্লেন মানুষ জন্ম সহসা লাভ হয় না। মানুষ শরীর লাভ করত যে ঈশ্বর দর্শনের জন্য প্রাণপণ না করে তার মানুষ শরীর ধারণ করাই বৃথা।

বাবা ভাষণ শেষে প্রণাম নিয়ে এক বাড়ীতে পদধূলি দান করে এসে রাত্রের প্রসাদ নিয়ে প্রায় ১টার সময় বিশ্রাম নিলেন।

৯ই মাঘ শনিবার ১৩৬৬ বাবা খুব ভোরে প্রায় ৪টায় উঠেছেন। শৌচান্তে ভস্মলেপন তিলক ধারণ ও প্রাতঃকালীন পূজার পর প্রণাম নিতে বসলেন। সকাল ৭টায় জলপাইগুড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ৭টায় আম বাড়ী বিমান স্টেশনে উপস্থিত হলেন। ৮টায় প্লেন ছাড়ার কথা ছিল কিন্তু প্লেন যখন বাবাকে নিতে নামলেন তখন ৮টা। সকলের ওজন হল। বাবার অনুমানে লেখা হয়। বাবা বললেন তা হলে মিথ্যা হবে। সীতারাম ওজন হবে—১ মণ ৯ সের হলেন। অনুমানে একমণ সাত করা হয়েছিল। বাবা হাসতে হাসতে বললেন সীতারামকে সব ঠকিয়ে দিয়েছিলি। বোধহয় ১-১৫তে প্লেন ছাড়ে, পৌনে এগারটায় দমদম বন্দর অবতরণ করে। প্লেন থেকে নামতেই প্রণামপর্ব শুরু হয়। সঙ্গী ছেলেরা সমস্ত জিনিষপত্র গুছিয়ে তৈরী হতেই বাবা মোটরকারে এসে বসলেন। বোধহয় রাস্তায় ভক্তদের কয়েক স্থানে দর্শন দেন। তারপর জয়নগরে শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্রের পৈতৃক বাসভবনে যখন এলেন তখন প্রায় পৌনে দুটো।

আজ জয়নগরবাসীর আনন্দের সীমা নাই। স্থানীয় জমিদার কুলোদ্ভব ও মিত্র বংশের রত্নস্বরূপ শ্রীযুক্ত শচীনদার জন্য তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁদের গ্রামে লাভ করলেন। শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি ও শতশত লোকের মুখোচ্চারিত হরেকৃষ্ণ নামের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হয়ে উঠল। প্রায় ৩।৪ হাজার নরনারী দর্শনের জন্য হুড়োহুড়ি করতে থাকে। শচীনদা প্রথমে বাবাকে একবার প্রণাম মঞ্চে নিয়ে গেলেন। সেখানে একবার দর্শন দান করে বাবা নিভৃতকুঞ্জে আসেন। ফলাদি গ্রহণ করত দীক্ষার্থীদের প্রাথমিক কিছু কাজ দিয়েই আবার প্রণাম নিতে আরম্ভ করেন। মধ্যে প্রণাম স্থগিত রেখে দীক্ষা হয়ে যায়। তারপর সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অন্নপ্রসাদ নিয়ে বিশ্রামের জন্য নিভৃতকুঞ্জে গমন করেন। অল্প বিশ্রামের পর আরতি নাম পাঠ প্রার্থনার শেষে একদিকে ছেলেদের মায়েদের নিয়ে বসলেন। অনেকে অনেক কিছু প্রার্থনা অভিযোগ শুনে রাত্রি দেড়টায় বিশ্রামের অবকাশ পান।

১০ই মাঘ রবিবার প্রাতঃকালীন পূজার পর বাবা বললেন ৯টার বাইরে যেয়ে ভাষণ দেব। ৯টায় ভাষণ আরম্ভ হয়, প্রায় ১১টায় শেষ হয়। তারপর অনুমান আড়াইশত দীক্ষাদান করার পর অন্নপ্রসাদ নিয়ে দীক্ষার্থীদের প্রণাম নেবার জন্য ঠাকুর বাটীর ভেতরেই বসেন। বহু কীর্তন দল সাজান ছিল। প্রায় ৫।৬ হাজার নরনারী প্রতীক্ষা করছিলেন বাবা গ্রাম পরিক্রমায় যাবেন বলে। বাবা আসতেই প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি হয়, প্রচণ্ড ভীড়ের জন্যই বোধহয় বাবার গ্রাম পরিক্রমা সব হল না। ফিরে এসে বাবা অধ্যাপক রামেন্দু দত্তের পৈতৃক বাসভবন মজিলপুরে যান। রাত্রি ৯টায় ফিরে এসে প্রসাদ মাত্র করে দিয়েই গাড়ীতে বসলেন কলিকাতা যাবার জন্য। রাত্রি ১০টায় বালিগঞ্জস্থিত বিরলদার বাড়ীতে উঠলেন। রমেশদা পূর্বেই এসে বাবার জন্য রাত্রের খাবার তৈরী করে রাখেন। সেখানে কিছু নিয়েই বাবা আমহার্স্ট স্ট্রীটে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। বাবা দণ্ডবৎ হয়ে পূজ্যপাদের চরণে প্রণাম করলেন। উভয়ের গাঢ় আলিঙ্গন যেন হরিহর মিলন। উভয়ে আসন গ্রহণ করে বসলেন। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন কেমন আছেন? পূজ্যপাদ মহোদয় বললেন—'ওই শরীর (বাবাকে দেখিয়ে) যতদিন আছেন ততদিন আমার আর কোন খারাপ হবে না হতেই পারে না। তিনি আরও গদগদ কণ্ঠে বললেন—আপনি আর কেউ নন সাক্ষাৎ ভগবান এ ধারণা এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় হয়েছে। সকলেই জেনেছে এ আমার কঠিন ব্যাধি, দুরারোগ্য আপনার কৃপাতেই ভাল হয়েছে। তারপর বললেন আপনার দর্শনের জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছিলাম। জয়গুরু পত্রিকায় আপনার পরিভ্রমণ সূচী বারবার পড়ছি। কবে কোলকাতা আসবেন কবে দর্শন পাব এই চিন্তা করছি। আমি ভেবেছিলাম কাল আপনি গোরাচাঁদ রোডে আসছেন কাল নিশ্চয়ই আপনার দর্শন লাভ করব কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন আজই হয়ে গেল। আমি আপনাকে দুদিন স্বপ্নেও দেখেছি। আপনি এলেন প্রণাম করলেন...তারপর আলো জ্বলল। সেদিন খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। আপনি কাল যখন কলকাতায় আছেন তখন নিশ্চয় কাল আসবেন। বাবা বললেন হাঁ কালও আপনার চরণ দর্শন করে যাব তবে হয়ত এইরকম রাত্রি হবে। প্রায় ১ ঘণ্টার পর বাবা আবার পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহোদয়কে প্রণাম করে, ঐ স্ট্রীটেই ধাইমাকে দেখে রাত্রি প্রায় ১টায় পার্কসার্কাস গোরাচাঁদ রোডে শ্রীতড়িৎভূষণ রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। প্রণাম মঞ্চ দীক্ষার স্থান প্রভৃতি দেখে সকলের প্রণাম নিয়ে রাত্রি তিনটের সময় বিশ্রাম নিলেন।

১১ই মাঘ সোমবার। বাবা পূজাদি সমাপন করে তাঁর কুটিরে প্রায় দুঘণ্টা আসনস্থ হয়ে আপনভাবে কাটালেন। সকাল থেকেই বেশ ভীড় জমে উঠেছে। বেলা ৯টায় বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের ও কাজের লোকদের প্রায় ২৫জনকে বাবা দীক্ষা দেন। তারপর বাবারই শ্রীচরণাশ্রিত সন্তান শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আপন কাকা) ও শ্যামানন্দদার মামাতো ভাই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রফেসর সুগায়ক ডঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এসে বাবার চরণ বন্দনা করেন। বাবা তাঁহাদের সঙ্গে কথার পর দীক্ষার্থীদের প্রাথমিক কিছু কাজ দিয়ে বাইরে প্রণাম মঞ্চে প্রণাম নিতে বসলেন। আজকের প্রণাম স্থানটি বেশ বড় দেখে বাবার পছন্দ হয়েছে দর্শনার্থী শিষ্যভক্তের আজ সংখ্যা অনুমান করা যায় না। সবসময় যে কত শতশত দর্শনার্থী আসছেন যাচ্ছেন তার শেষ নাই। দীক্ষার্থীও কিঞ্চিদধিক চারশো। বেলা আড়াইটে পর্য্যন্ত প্রণামার্থীর শেষ না হওয়ায় দীক্ষা শুরু হয়। দীক্ষার এক ফাঁকে প্রায় ৪টের সময় অন্নপ্রসাদ নিয়ে আবার দীক্ষা দিতে শুরু করেন। সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হয়। তারপর বাণীদত্তের (বাণীদার) পরিচালনায় বাবার মগরা ওঙ্কারেশ্বর প্রভৃতি স্থানের পতিতোদ্ধারণ লীলা 'ফিল্ম্-এ' দেখান হয়। পরে সঙ্গী ছেলেদের হাওড়া হয়ে জনাই যাবার অনুমতি দিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টায় তড়িৎদার বাড়ী থেকে বাবা জনাই অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে কোলকাতায় প্রথমে ইণ্টালীতে সুধীর বিশ্বাসের জামাতার বাড়ী হয়ে পরপর আমহার্স্ট স্ট্রীটে ধাইমা ও পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায়কে দর্শন করে ঐ স্ট্রীটেই ডাঃ উমেশদার বাড়ী ও আর এক সেবকের বাড়ী, ওখান থেকে কমলাপিসিমার বাড়ী রামদার বাসা পাথুরিয়া ঘাটায় দুর্লভদার বাড়ী। সেখান থেকে রাত্রি ১২টায় তাঁরই সীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রঞ্জিতদা ১০।১২ জন বাবার শুভাগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। বিদ্যালয়ের দ্বিতলভবন নির্মাণের জন্য পাঁচখানি ইঁট স্থাপন করে আগন্তুক একজনকে উপদেশ ছলে ছোট একটি ভাষণ দিয়ে রাত্রি একটা পনেরো মিনিটে সীতারাম বৈদিক বিদ্যালয় থেকে দেড়টায় বালি। তিনটের সময় বালি থেকে যাত্রা করে সাড়ে ৪টার পর জনাই-এ শ্রীপ্রসাদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে প্রায় ভোর ৫টায় একটু বিশ্রামের অবসর পান।

১২ই মাঘ। আমরাও ৫টায় শুয়ে ৭টায় উঠে বাবার কাছে যেয়ে দেখি বাবা অনেকক্ষণ উঠেছেন। বাড়ীর ছাদে রোদে বসে তিলকাদি ধারণ করলেন। আজও দীক্ষার্থী প্রায় তিনশো। দর্শনার্থীও সহস্রাধিক। দীক্ষার্থী ও দর্শনার্থীদের প্রণামাদি নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত অতিবাহিত হল। অন্যান্য সঙ্গী ছেলেদের জনাই থেকে বর্ধমান স্টেশন হয়ে বোলপুরে যাবার অনুমতি করলেন। বাবা রাত্রি ৯টায় জনাই থেকে রওনা করে প্রথমে শ্রীরামপুরের পুলিশ ইন্সপেক্টর শ্রীতারাপদ ঘটকের বাসায় পদধূলি দান করেন। ইনি বাবার কৃপাপ্রাপ্ত সেবক। এখান থেকে বৈদ্যবাটী ছেলেদের কাতর প্রার্থনায় তাদের দর্শন দিয়ে একটু উপদেশ দিয়ে রাত্রি প্রায় ১২টায় মগরা অনন্ত-কালোদ্দিষ্ট নামযজ্ঞ মণ্ডপে প্রণাম করে ভক্তদের প্রণাম নিয়ে রাত্রি প্রায় দুটো-আড়াইটের সময় বর্ধমানে শ্রীঅনাদিদার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে রাত্রি তিনটের পর বিশ্রাম করেন। অনাদিদার মেজদা পুলিশ সাহেব শ্রীযুক্ত তারকদা বাবার সঙ্গেই জনাই থেকে আসেন।

১৩ই মাঘ বুধবার—সকালে বর্ধমানে বেশ ভীড় হয়ে উঠল। বাবা পূজাদি সেরে ফল প্রসাদ নিতে বসেন। আনন্দময়ী মা বাবার খাবার জন্য ছোলাটোপা আলুরচপ নিমকি প্রভৃতি করে বাবাকে খেতে দিয়েছেন। বাবা অল্পমাত্র গ্রহণ করে সেগুলিকে সব চটকে আনন্দময়ীমার নামে পিণ্ডদান করলেন—সকলেই খুব হাসতে থাকেন। আমরাও মহানন্দে পিণ্ডপ্রসাদ খেয়ে বাবাকে নিয়ে বেলা ৯টায় বর্ধমান স্টেশনে উপস্থিত হলাম।

৯-৪৪ মিনিটে বোলপুর গামী ট্রেন ছাড়ল। ১১টায় ট্রেন বাবাকে নিয়ে বোলপুরে স্টেশনে উপস্থিত হলেন। বাবাকে স্বাগত জানাবার জন্য সহস্র লোকের ভীড় হয়। তাঁরা বাবাকে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। সে দৃশ্য মনে করে আমিও লেখনীকে সংযত করে উপস্থিত বাবার শ্রীচরণে প্রণামপূর্বক শেষ করলাম।

সমাপ্ত